

দ্যা টিভাউন্স

ফিরে আসার গল্প



রূপান্তর

সামছুর রহমান ওমর
কানিজ শারমিন

দ্যা রিভার্স : ফিরে আসার গল্প

রূপান্তর : শামছুর রহমান ওমর
কানিস শারমিন সিঁথি



গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ইবলিসের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমেই লড়াইটা শুরু হয়েছিল। আজ অবধি সে লড়াই অব্যাহতভাবে চলছে। তখন থেকে এখন, ইবলিসের তার মিশনে সদা তৎপর। জাহেলিয়াতের সমস্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে মানুষদের ঈমানচ্যুত করার প্রচেষ্টা চলেছে, চলছে। তবুও ইসলাম তার আপন মহিমায় ফুলেল সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি মাটিতে। স্বভাব বৈশিষ্ট্য দিয়ে ইসলাম ঈমানদারদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে কেবল সুদৃঢ়ই করেনি; একইসাথে অবিশ্বাসীদের চিন্তার সাগরেও ঢেউ তুলেছে তুমুল বেগে। দুনিয়ার সকল তন্ত্র-মন্ত্র-আদর্শ ইসলামের পতাকাতলে লুটিয়ে পড়েছে অনিবার্যভাবে। আধুনিক সভ্যতার মোড়কে চাকচিক্যময় দুনিয়ার কৃত্রিম আলোকোজ্জ্বল উপস্থাপনাও জাহেলিয়াতকে রক্ষা করতে পারছে না। শান্তির সন্ধানে দিগ্ভ্রান্ত লাখো মুসাফির পরম আশ্রয় হিসেবে ইসলামের বর্মই পরিধান করছে। এ যেন মরণের বুক তৃষ্ণার্ত পথিকের শীতল পানির সন্ধান পাওয়া!

‘দ্যা রিভার্স : ফিরে আসার গল্প’ বইয়ে আমরা এমনই তৃষ্ণার্ত ১৩ জন মানুষের ইসলামের পতাকাতলে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়ার গল্প পড়ব। বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের ভাই-বোনদের হৃদয়ের হাহাকার দেখব। ইসলামের কোন সম্মোহনী শক্তি তাদের টেনে ধরল, কোন সে পরশপাথর তাদের হৃদয়কে বিগলিত করল, কী তাদের ইসলাম গ্রহণের মতো এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে স্পৃহা যোগাল- প্রতিটি গল্পে তার উত্তর পাবেন ইনশাআল্লাহ। অবিশ্বাসীরা প্রতিটি গল্পের সাথে নিজেদের জীবনধারা মিলিয়ে নিতে পারবেন। আমরা বিশ্বাসীরাও হৃদয় থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব, জন্মসূত্রে কত মূল্যবান পরশমণি পেয়েছি।

সামছুর রহমান ওমর ও কানিজ শারমিন দম্পতিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। বইটি নিয়ে উভয়ই অনেক শ্রম দিয়েছেন। অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ভাষায় গল্পগুলো সাজিয়েছেন। এই বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন’ অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি প্রাণ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সংস্কার থেকে হয় সংস্করণ।

মানুষ ঘর বানায়, বাড়ি বানায়। মনের মতো করে প্রাসাদ তৈরি করে। সময়ের পরিক্রমায় সেই সব ইমারতের সংস্কার হয়। অঙ্গ সজ্জায় পরিবর্তন আসে। মানুষের রুচি বদলায়। সেইসাথে বদলায় বাড়ির কাঠামো।

বইয়ের ক্ষেত্রে হয় সংস্করণ। কোনো একটা সময়ে একটা বই লেখা হয়। কালে কালে তাতে নতুন নতুন তথ্য সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। লেখক/প্রকাশক বইটাকে নতুন করে পরিমার্জনের প্রয়োজন অনুভব করেন। বাক্য বিন্যাস, যতি চিহ্নে পরিবর্তন আসে। ভুল-ত্রুটি শুদ্ধ করা হয়। অঙ্গ-সজ্জা, কাঠামোর খোলনলচেতে বদল আসে।

আলহামদুলিল্লাহ! দ্যা রিভার্স : ফিরে আসার গল্প প্রকাশের পর আমরা পাঠকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছি। যারা বইটি পড়েছেন তারা তাদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন। অনেকে জানিয়েছেন, তাদের বাবা-মা, স্বামী কিংবা স্ত্রী দিন-রাত ভুলে বইটি পড়েছেন। অনেকে হারিয়ে যাওয়া বই পড়ার অভ্যাস ফিরে পেয়েছেন।

অনেকে কেঁদেছেন। ফিরে আসা মানুষদের গল্প পড়ে আপ্লুত হয়েছেন। নিজের আত্ম অনুসন্ধান নতুন করে উৎসাহী হয়েছেন। স্রষ্টার পদতলে নুয়ে পড়েছেন সিজদায়। অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়।

অনুবাদক হিসেবে সাধারণ পাঠকের এই অভিব্যক্তি আমাদেরকেও ছুঁয়ে যায়। সাহস যোগায়, অনুপ্রাণিত করে। আগামী দিনগুলোতে আরও ভালো কিছু করার জন্য আমরা উৎসাহ খুঁজে পাই।

এই সংস্করণে আমরা চেষ্টা করেছি, বইটিকে আরও প্রাঞ্জল ও সাবলীল করে তোলার জন্য। বেশ কিছু গল্পে বাক্য বিন্যাস ও যতিচিহ্নে পরিবর্তন এসেছে। ‘পথহারা এক মুসাফির’ গল্পে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় গোটা একটা প্যারা বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ‘মক্কার পথে’ ‘এক পপস্টারের আত্মকাহিনি’ ‘MTV থেকে মক্কা’ গল্পে নতুন করে কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বইতে কিছু বানান বিভ্রাট ছিল। সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। সচেতন পাঠক আগের সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখলে পরিবর্তনগুলো টের পাবেন। আশা করি, বইটির এই সংস্করণ পাঠকের কাছে আগের চাইতে আরও বেশি সুখপাঠ্য মনে হবে।

মহান রবের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টাকে কবুল করেন। এই বইয়ের লেখক, পাঠক, প্রকাশক সবাইকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আবৃত রাখেন।

লেখকের কথা

আপনাদের একটা গল্প শোনাই। আমাদের খুব প্রিয় একটা গল্প।

খলিফা মামুনের সময়ের ঘটনা।

দেশব্যাপী খরা চলছিল। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ক্ষুধা ও দরিদ্রের মাঝে থেকে কঠিন সময় পার করছিলেন। তেমনি এক প্রত্যন্ত গ্রামের মরুচারী বেদুইন ঠিক করলেন, খলিফার সাথে দেখা করবেন। জানাবেন তার কষ্টের কথা।

যেই ভাবা সেই কাজ। বেদুইন যাত্রা শুরু করলেন রাজধানী বাগদাদের পথে। অনেক দূরের পথ। বাহন বলতে কিছুই নেই। একমাত্র পায়ে হাঁটাই সম্ভব। মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পথ চলতে চলতে বেদুইন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। যতদূর চোখ যায়, পানির কোনো দেখা নেই। বেদুইন তবুও ক্লান্ত অবসন্ন দেহ টেনে নিয়ে সামনে চললেন। খলিফার দেখা যে তাকে পেতেই হবে।

বেশ কিছুটা পথ চলার পর বেদুইন থমকে দাঁড়ালেন। এ কি! পানি দেখা যাচ্ছে না? বেদুইন দৌড়ে এলেন। এক জায়গায় এক গর্তে আসলেই পানি জমে আছে। তৃষ্ণার্ত বেদুইন দুহাতের আজলা ভরে চুক চুক করে সবটুকু পানি পান করলেন। আহা! এ যে অমৃত! এত মিষ্টি, এত চমৎকার পানি যে আর জীবনেও সে পায়নি।

বেদুইন মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালেন। তার মনে হলো, আল্লাহ অনেক মেহেরবান। এ পানি জান্নাতের না হয়ে পারেই না। আল্লাহ নিশ্চয় দয়া করে শুধু তার জন্যই এ পানি পাঠিয়েছেন। ভাবলেন, খলিফার কাছে যখন যাচ্ছি, তখন ওনার জন্য উপহারস্বরূপ এ জান্নাতের নেয়ামত নিয়ে যাই। খলিফা যা খুশি হবেন না!

বেদুইন সে পানি একপাত্রে ভরে হাজির হলেন রাজদরবারে। খলিফা খেয়াল করলেন, এই অপরিচিত লোকটি এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কিছু বলছে না। বোধহয় সাহস করে উঠতে পারছে না।

খলিফা নিজ থেকেই তার পরিচয় জানতে চাইলেন। বেদুইন তার পরিচয় জানালেন। তারপরে গর্বভরে বললেন, ‘মহামান্য খলিফা! অভাবে পড়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। তবে আমি নিঃস্ব হলেও আপনার দরবারে একেবারে খালি হাতে আসিনি। আমি আপনার কাছে আসার সময় পথিমধ্যে এক জান্নাতি নেয়ামতের সন্ধান পেয়েছি। সে নেয়ামতের পানি আমি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। সে পানি এত মিষ্টি, এত চমৎকার...যার তুলনা পৃথিবীতে বিরল।’

খলিফা আগ্রহভরে সে পানি মুখে তুললেন। কয়েক চুমুক দিয়ে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর উজ্জ্বল চোখে বেদুইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার নিয়ে আসা পানি আসলেই অত্যন্ত মিষ্টি এবং খুব চমৎকার। এর তুলনা সত্যিই বিরল। তুমি যে এত কষ্ট করে আমার জন্য এই পানি নিয়ে এসেছ, আমি এই জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তোমাকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি। তুমি তা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। এখান থেকে বেরিয়ে আর সামনে যাওয়ার দরকার নেই।’

দরবারে উপস্থিত লোকজন তো অবাক। কী এমন মহামূল্যবান পানীয়, খলিফা যার এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন! খলিফার দরবারে নিয়ম ছিল, কেউ কোনো খাবার জিনিস আনলে, খলিফা অন্যদেরকেও তা খেতে দেন। কিন্তু এই পানীয় খলিফা কাউকে খেতেও দিলেন না। আবার লোকটিকে বললেন, যেন সামনের দিকে না যায়। এসবের মানে কী?

লোকটি চলে যেতেই সবাই খলিফার কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

খলিফা এক গাল হেসে বললেন ‘এই পানির মতো এত বিস্মাদ পানি আমি আমার জীবনেও খাইনি। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। পথের মাঝে কোনো এক গর্তে হয়তো বৃষ্টির পানি জমেছিল। লোকটা সেই পানি আমার কাছে বয়ে নিয়ে এসেছে। বেচারী মরুভূমির মানুষ। সুপেয় পানি খুব একটা চোখে দেখেনি। পাশাপাশি পথ চলতে চলতে তৃষ্ণার্ত ছিল। এ অবস্থায় এই পানি তার কাছে অমৃত মনে হয়েছে। সে আন্তরিকতা থেকেই আমার জন্য নিয়ে এসেছে। এখন আমি যদি আপনাদের কাউকে এই পানি খেতে দিতাম, তাহলে তো রহস্য ফাঁস হয়ে যেত। শুধু শুধু মানুষটা সবার সামনে লজ্জা পেত। আমি তাকে নিষেধ করেছি, যাতে সে সামনে না এগোয়। কারণ, আর কিছুদূর গেলেই দজলা-ফোরাতে। দজলা-ফোরাতের কাছে এই পানির স্বাদ তুচ্ছ। সে পানি পান করলে তার ভুল ভেঙে যেত। আমি চাইনি, লোকটা এক ধরনের অনুশোচনায় পুড়ুক। যেন তার এ অনুভূতি না হয়, হায় হায় আমি খলিফাকে কী দিয়ে এসেছি!’

আমরা যারা ইসলামকে জন্মসূত্রে পেয়েছি, আমরা এর মর্ম বুঝতে পারি না। কিন্তু যারা অমুসলিম পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন তারা বোঝেন ‘ইসলাম’ আল্লাহ তায়ালার কত বড়ো নেয়ামাত। তাদের অবস্থা মরুভূমির সেই তৃষ্ণার্ত মুসাফিরের মতো। তাদের হৃদয় অসীম তৃষ্ণায় শুষ্ক। প্রখর রৌদ্রে সুকোমল পানীয়ের মতোই ‘ইসলাম’ তাদের দেহ-মনে তৃপ্তি আনে। ইসলাম তাদের কাছে অনেক কষ্টে সাগর সেচে আনা মুক্তো দানার মতো। ঝলমলে উজ্জ্বল। যার জ্বলজ্বলে আলো, আঁধারের মাঝেও জ্বালে আলোর রেখা।

এই বইয়ে আমরা চেষ্টা করেছি ১৩ জন মানুষের কাহিনি তুলে আনতে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদি... তারা এসেছেন একেকজন একেক ধর্ম থেকে। এদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এই বইয়ের কাহিনিগুলো বেশিরভাগই ইউটিউব থেকে সংগ্রহ করা। ‘MTV থেকে মক্কা’ ও ‘মক্কার পথে’ কাহিনি দুটো তাদের লেখা বই থেকে নির্বাচিত অংশের রূপান্তর। মুহাম্মাদ আমিরের কাহিনি লেখা হয়েছে কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টাল অবলম্বনে।

এই গল্পগুলোকে বই আকারে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-কে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনলাইনের পাঠক-পাঠিকাদের, যারা নিয়মিত আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। পরিশেষে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা আমাদের মা-বাবার প্রতি, যাদের ঐকান্তিক প্রেরণা ও উৎসাহ না পেলে লেখালেখির জগতে আমাদের হাতেখড়ি হতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের মা-বাবাকে তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করে নেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কল্যাণ দান করেন। আমিন।

‘দ্যা রিভার্স’-এর প্রতিটি কাহিনিই মর্মস্পর্শী। প্রতিটি গল্পই আঁধার থেকে আলোর পথে ফেরার আনন্দে উদ্বেল। প্রতিটি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে আছে জীবনের সঠিক মানে খুঁজে পাওয়ার আকুতি, ইসলামের সংস্পর্শে এসে নিজের জীবনকে রাঙানোর পরিতৃপ্তি।

আসুন, তাদের মতো করেই আমরা জীবনকে সাজাই, জীবনকে রাঙাই।

‘মুছে যাক সব হতাশা, কষ্ট, গ্লানি
চোখ জুড়ে থাক আশার চাহনি।’

সামছুর রহমান ওমর
কানিজ শারমিন সিঁথি
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

সূচিপত্র

বন্দি থেকে মুসলিম	১৩
ইভন রিডলি	
আমি ইউসুফ এস্টেস বলছি	৪৩
ইউসুফ এস্টেস	
আসুন বলি ‘আলহামদুলিল্লাহ’	৬০
লরেন বুথ	
জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে	৬৮
আব্দুর রহিম গ্রিন	
রহস্যময় কুরআন	৮৯
ড. জেফরি ল্যাং	
বৌদ্ধ থেকে আলোর পথে	১০৩
হুসাইন ইয়ি	
মসজিদ ভাঙা হাত আজ মসজিদ গড়ার কারিগর	১০৮
মুহাম্মাদ আমির	
শৈলেশের গল্প	১২০
সালাহ উদ্দিন প্যাটেল	
পথহারা এক মুসাফির	১৩০
ইউসুফ চেম্বারস	
কমিউনিজমের হাত ধরে	১৪০
ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস	
মক্কার পথে	১৫৫
মুহাম্মাদ আসাদ	
এক পপস্টারের আত্মকাহিনি	১৬৮
ইউসুফ ইসলাম	
MTV থেকে মক্কা	১৭৫
ক্রিসটিন বেকার	

বন্দি থেকে মুসলিম

ইভন রিডলি

এক

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর।

দিনটার কথা মনে হলেই এক ভয়ংকর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দু-দুটো প্লেন এক এক করে ঢুকে গেল বিশাল টুইন টাওয়ারের পেটের ভেতর। ভোজবাজির মতো ধসে পড়ল আকাশছোঁয়া দুটি টাওয়ার। জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল অনেক মানুষ। এই ঘটনাই যে আমার জীবনটা এমন করে পালটে দেবে, তা কে জানত!

ও হ্যাঁ, আমার পরিচয়টা আগে দিয়ে নিই। আমার নাম ‘ইভন রিডলি’। পেশায় সাংবাদিক। আমি তখন কাজ করতাম লন্ডনের ‘সানডে এক্সপ্রেস’ পত্রিকায়।

আমাকে একজন ফোনে বলল, ‘জলদি তোমার টিভি ছাড়ো। টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছে। সব চ্যানেল ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে।’ টিভিতে যা দেখলাম, তা নিজের চোখেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রথমটায় ভাবলাম, এটা বোধ হয় কোনো দুর্ঘটনা। কিন্তু না, আমাকে অবাক করে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি প্লেন সোজা ঢুকে গেল টাওয়ারে। নিমিষেই ধসে পড়ল টুইন টাওয়ার, আমেরিকার অহংকার।

কিছু সময় পর সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল— এটি নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি ছিল পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা। আমি উপলব্ধি করলাম, পেশাগত কারণে খবর সংগ্রহের জন্য আমার খুব দ্রুতই নিউইয়র্ক যাওয়া উচিত।

কিন্তু আমেরিকাগামী সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমেরিকার সীমান্ত। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে আমেরিকাতে ঢোকা এখন খুব কঠিন।

লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে তখন আমেরিকান মানুষদের ভিড়। নিজ দেশে স্বজনদের কাছে ফেরার জন্য সবাই ব্যাকুল। দ্রুত আমেরিকায় ফিরতে সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে তাদেরকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকেট দেওয়া হচ্ছিল। অনেক চেষ্টায় চার দিন পর আমি নিউইয়র্কগামী প্লেনের টিকেট পেলাম।

বোর্ডিং পাসের জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় আমার সম্পাদকের ফোন এলো— ‘রিডলি!’

আমি তাকে সারথাইজ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলাম, ‘জানো, আমি টিকেট পেয়ে গেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্লেনে উঠতে যাচ্ছি।’

ওপারে কিছু সময়ের নীরবতা।

তারপর উত্তর এলো, ‘রিডলি! আমাদের পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। তুমি সোজা পাকিস্তান চলে যাও। তারপর আফগানিস্তান।’

‘কী!’ আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ‘আফগানিস্তান?’

‘হুম! ঘটনার শুরু আফগানিস্তান থেকে। সারা পৃথিবীর চোখ এখন সেদিকেই থাকবে। তোমার যাত্রা শুভ হোক।’ লাইনটা কেটে গেল।

আমার বাব্ব বোঝাই শীতের কাপড়। আমি দাঁড়িয়ে আছি নিউইয়র্কগামী প্লেনের লাইনে। আমাকে কিনা এখন যেতে হবে মরুর দেশ আফগানিস্তানে। অবিশ্বাস্য!

কী আর করা! আমেরিকার টিকিট বাতিল করে দুবাইয়ের টিকিট কাটলাম। দুবাই হয়ে পৌঁছালাম পাকিস্তানে।

আফগানিস্তানের ভিসা পাওয়ার জন্য আমি তিন-তিনবার চেষ্টা চালালাম। ভিসা পেলাম না। অথচ সংবাদ সংগ্রহের জন্য আফগানিস্তানে না গেলেই নয়। এখন উপায়?

বিবিসি’র সাংবাদিক জন থমসন এক অভিনব বুদ্ধি বের করল।

দুই

জন থমসন একদিন আমার কাছে এসে বলল, ‘দেখ! আমি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছি।’ জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোটাই কালো বোরকায় ঢাকা। সামনে বিরাট এক মূর্তি, অথচ তাঁর শরীরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তাৎক্ষণিক আমার মাথায় দারুণ বুদ্ধি খেলে গেল। আমি ভাবলাম, ‘আরে এরকম বোরকা পরে তো আমিও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। তারপর ঢুকে যেতে পারি আফগানিস্তানে। জন থমসন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে, আমি কেন নয়?’

আমার দুই গাইডের একজন পাকিস্তানি, আরেকজন জন্মসূত্রে আফগান। তাদের সাথে বসে দারুণ এক বুদ্ধি আঁটলাম। ঠিক হলো, আমরা বিয়ে বাড়ির লোক সাজব। আমি থাকব বোরকায় ঢাকা। তারপর কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি এমন ভাব করে ঢুকে পড়ব আফগানিস্তানে।

যেই ভাবা সেই কাজ।

একদিন আমরা পাকিস্তান সীমান্ত ঘেঁষে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমাদের গাড়ি তখন চলছিল ‘খাইবার পাস’^১ দিয়ে। খাইবার পাস পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো গিরি উপত্যকা। দুপাশে পাহাড় আর সবুজ ভূমিঘেরা চমৎকার সব দৃশ্য। আমার ধারণাই ছিল না, খাইবার পাস এত বড়ো! আমি মনে করেছিলাম, এটার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩০ গজ হবে। আসলে এর দৈর্ঘ্য ৩৪ মাইল। ইস! কী বোকাই না ছিলাম আমি!

আমার মনে তখন চিন্তার ঝড়। আফগানিস্তান! না জানি সেখানকার মানুষগুলো কেমন? বুশ-ব্ল্যেয়ারের ভাষায় সেখানে ‘শয়তানের শাসন’ চলছে। মহিলারা চরম নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত জীবনযাপন করছে। অধিকার বলতে তাদের কিছুই নেই। তালেবান শাসকেরা এতই খারাপ, ছোটো বাচ্চাদেরও ঘুড়ি উড়াতে দেয় না।

কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে যুদ্ধ। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ, সবচেয়ে গরিব দেশের ওপর হামলা চালাবে। না জানি সেখানকার মানুষগুলো কী ভাবছে?

হঠাৎ ঝাঁকুনিতে আমার চিন্তার রেশ কেটে গেল। তাকিয়ে দেখি আমাদের গাড়ি থেমে গেছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ‘নো ম্যানস ল্যান্ডে’^২। একটু দূরেই আফগানিস্তান সীমান্ত।

আমরা দূর-দূর বুকে এগিয়ে গেলাম চেকপোস্টের দিকে। ভয়াল দর্শন সব প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। মাথায় পাগড়ি, ইয়া লম্বা আলখাল্লা, মুখে লম্বা দাড়ি। ভয়ংকর তাদের চাহনি। তাদের হাতের ‘কালানিকভ’ রাইফেল সূর্যের আলোয় চকচক করছে। আমার বুকের ভেতর তখন দুম দুম ড্রাম বাজছে। এতটাই জোরে যে, আমি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিলাম হৃদপিণ্ডের আওয়াজ।

একবার মনে হলো উলটো দিকে ফিরে দৌড় দিই। কিন্তু তখন আর পেছন ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না।

অবাক কাণ্ড! ওরা আমার দিকে ভালো করে তাকালই না। একবারের জন্যেও না। হয়তো বিরাট বোরকার আড়ালে কোনো মহিলা ভেবেই। গাইডরা আমাকে ভিন্ন এক আফগান মহিলা বলে পরিচয় দিলো। ভুয়া একটি আইডি কার্ডও দেখাল।

একটু পরে গাড়িতে চড়ে বসলাম। আমার তখন দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানে চলে এলাম। পুরুষ শাসিত আফগানিস্তান... যা নিয়ে পাশ্চাত্যে দুর্নামের শেষ নেই।

আমরা এসে পৌঁছলাম ‘জালালাবাদ’। এটা আফগানিস্তানের অন্যতম বড়ো এক শহর। একটা বড়ো মার্কেটের সামনে এসে গাড়ি থামলাম। দেখি, পুরুষেরা কাঁধে করে বাজারের বড়ো বড়ো ব্যাগ নিয়ে বের হচ্ছে। ভাবলাম, ‘বাহ, দারুণ তো! এখানে পুরুষেরা বাজার-সদাই করে। পাশ্চাত্যে তো শপিং মল থেকে বাজার-সদাই সবসময় আমাদের নারীদেরই করতে হয়।’

পরে জানলাম, এখানকার নিয়মকানুন খুব কড়া। মহিলারা মাহররম পুরুষ ছাড়া অপরিচিত লোকদের সাথে কথা বলতে পারে না। নিয়ম নেই। আমি বোরকায় ঢাকা অনেক মহিলাকেও দেখতে পেলাম। তারা তাদের পুরুষ সঙ্গীদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হলাম। সবার চেহারা কেমন হাসিখুশি। সবার মধ্যে সুখী সুখী ভাব। দুদিন পরে আমেরিকা উড়ে এসে এদের ঘাড়ে বোমা ফেলবে, সেটা নিয়ে এদের কোনো চিন্তাই নেই।

আমরা এলাম ছোটো একটা গ্রামে। তখন কী এক উপলক্ষ্যে সেখানে বেশ আনন্দ ফুটি চলছিল। গ্রামের লোকজন গাইডের কাছে আমার পরিচয় জানতে চাইল। গাইড পশতু^৩ ভাষায় বিড়বিড় করে কী বলে গেল, আমি তার এক বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারলাম না। তবে এতটুকু বুঝলাম, গাইডের উত্তর শুনে তারা মোটেও খুশি হয়নি। তারা ভাবছিল, চারদিকে এখন যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। এর মধ্যে গাইড এক পশ্চিমা নারীকে নিয়ে এলো এখানে। ব্যাটার আক্কেল জ্ঞানটা কী শুনি!

তার ওপরে মোল্লা উমরের^৪ কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল— ‘কোনো লোক পশ্চিমা বিদেশিকে সাহায্য করলে তার জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে’। স্বভাবতই তারা গাইডের ওপর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে ভয়ও পাচ্ছিল, না জানি কখন ধরা পড়ে যায়!

আফগানরা জাতিগতভাবে ফুর্তিবাজ ও হাসিখুশি। খুব বেশিক্ষণ মনমরা হয়ে থাকা এদের ধাতে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের ভয় কমে এলো। দু-একজন মহিলা দোভাষীর মাধ্যমে আমার সাথে কথাও বলা শুরু করল।

বিশ বছর বয়সী এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই যে দুদিন পরে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, তোমার ভয় করছে না?’

বিরক্তিমাখা স্বরে সে উত্তর দিলো ‘আর বলবেন না। আমার খুব রাগ লাগছে।’

আমি জানতে চাইলাম ‘কেন?’

সে বলা শুরু করল, ‘আমি ছিলাম নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক নার্স। বছর দুয়েক আগে তালেবানরা হঠাৎ করেই সে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলো। আমি চলে এলাম গ্রামে। ভেবে দেখুন, আজ যদি আমি ঠিকভাবে আমার প্রশিক্ষণ শেষ করতে পারতাম, তাহলে এই যুদ্ধের সময় আমি কত কাজ করতে পারতাম! আহতদের সেবা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা....তা না, আমি এখন হাত-পা গুটিয়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে এসে পঁচে মরছি।’

কথার মাঝখানে এক বয়স্ক মহিলা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার চেহারায় তাক্কিল্য, দুহাত কোমরে রাখা। আমাকে ভালোমতো নিরীক্ষণ করে জানতে চাইলেন, ‘এই মেয়ে! তোমার ছেলেমেয়ে আছে?’

আমি উত্তর দিলাম, ‘আছে। একটা মেয়ে।’

‘মোটো একটা?’

‘জি, মোটো একটা।’

তিনি আমার বুকের ওপর সজোরে একটা ধাক্কা মারলেন, ‘তোমরা পশ্চিমা নারীরা আসলেই হতভাগা। তোমাদের বাচ্চা হয় মোটো একটা-দুইটা। আমাকে দেখ। আমার সন্তান মোটো পনেরোজন। যুদ্ধের মাঠে যখন তোমাদের সব সৈন্য মারা যাবে, আমি তখনো একে একে সন্তান জন্ম দিতে থাকব।’

এটা ভাবার কোনো কারণ নেই, আফগান মহিলারা লাজুক লাজুক আর জড়সড় মাটির মূর্তি। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, ‘বাপরে! এই যদি হয় মহিলার তেজ, তবে পুরুষেরা না জানি কেমন?’

আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, ‘এই যে আমেরিকা এসে আপনাদের ওপর বোমা ফেলবে, আপনাদের ভয় করছে না?’

তিনি সমান তেজে উত্তর দিলেন, ‘আসুক না আমেরিকান সৈন্য! এই গ্রামে যদি আসে, আর আমি যদি হাতের কাছে পাই, তবে জামা কাপড় ছিঁড়ে নিজ হাতে আমি ওদের শায়েস্তা করব।’

একটু শান্ত হয়ে তিনি আবার বললেন, ‘দেখ! তোমাদের ওখানে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু তাতে আমাদের কী দোষ! এর জন্য আমেরিকানরা কেন আমাদের ওপর বোমা মারতে চাইছে? আমরা কি কিছু করেছি?’

আমি তখন মনে মনে ফুঁসছিলাম। ‘কি! টুইন টাওয়ার হামলা এদের কাছে নেহায়েত একটা দুর্ঘটনা? যেখানে ছয় হাজারের অধিক মানুষ জ্বলে-পুড়ে মারা গেল, যেখানে সুবিশাল টুইন টাওয়ার ধ্বংসে পড়ল, প্রাণ বাঁচাতে একশো তলা থেকে মানুষ স্বেচ্ছায় লাফিয়ে পড়ল... এত বড়ো ঘটনাকে এরা দুর্ঘটনা বলে কী করে?’

পরে ভেবে দেখলাম, আসলে এদের দোষ নেই। তালেবান শাসনে বিদেশি টিভি দেখা বারণ। এরা তো জানেই না সে দৃশ্য, সে ঘটনা কতটা ভয়াবহ ছিল!

গ্রামে থাকতে থাকতে বিকেল হয়ে এলো। আমাদেরকে নিয়ে ভয়, উৎকর্ষা আবার মানুষগুলোর চেহায়ায় ফিরে এলো। অনেক বলে-কয়ে তাদের কাছ থেকে দু-চারটা ছবি নিলাম। বিদায় নিয়ে একটু এগোতেই দেখি, গ্রামের অদূরে গেইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুনতে পেলাম, পাকিস্তান তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। কাউকে আসতেও দিচ্ছে না, যেতেও দিচ্ছে না। পরদিন সকালে গিয়ে দেখি একই অবস্থা।

আমি পড়লাম মহা ঝামেলায়। আমার সম্পাদক যদি জানেন, আমি আফগানিস্তানে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছি, তাহলে বিশ্ব মিডিয়ায় হইচই পড়ে যাবে। চারদিকে আতঙ্ক ছড়াবে। আমাকে যে করেই হোক এখান থেকে বের হতে হবে।

কিন্তু উপায়?

গাইড বলল, ‘উপায় একটা আছে। আমাদেরকে চোরাচালানের রাস্তা (Smuggling Route) ধরে ফিরতে হবে।’

‘ওয়াও!’ আমি মনে মনে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম, ‘চোরাচালানের রাস্তা দিয়ে পালানো? এটা তো দারুণ রোমাঞ্চকর আর শিহরণ জাগানো ব্যাপার হবে। আমি আমার পত্রিকার জন্য ভালো একটা স্টোরি লিখতে পারব।’

আমি ভেবেছিলাম স্মাগলিং রুট হবে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গোপন কোনো রাস্তা। মাঝে মাঝে ঝোপ জঙ্গলেও লুকিয়ে থাকতে হবে। ওমা! অবাক কাণ্ড। যে রাস্তা ধরে সীমান্তের কাছে গেলাম, সেখানে দেখি বিরাট বাজার বসেছে। কেউ উট বিক্রি করছে, কেউ বিক্রি করছে কার্পেট। আবার কারও হাতে বিক্রির জন্য বিনোদনের বিভিন্ন জিনিসপত্র।

অনেক পুরুষকে দেখলাম। তারা এসেছেন যুদ্ধের জন্য নাম লেখাতে; যেন ‘বড়ো শয়তান’ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়।

আমার পায়ে ছিল আফগান জুতা। পথ চলতে চলতে তা ছিঁড়ে পা ফেটে রক্ত ঝরছিল।

আমি গাইডকে বললাম, ‘দেখ! সীমান্ত তো আর মাত্র দশ মিনিটের পথ। কোনো বাহন নেওয়া যায় না? আর হাঁটতে পারছি না।’

সে আমার দিকে সন্দ্বিহান দৃষ্টিতে তাকাল, ‘আপনি কি গাধায় চড়তে পারবেন?’

‘গাধা!’ মনে মনে ভাবছিলাম আরে ব্যাটা! আমি ঘোড়ায় চড়েছি, ঘোড়া নিয়ে দৌড়েছি। আর সে আমি এই পিচ্চি গাধায় চড়তে পারব না!

আমার ইশারা পেয়ে সে একটা গাধা নিয়ে এলো। গাধার পিঠে যেই না বসেছি, অমনি তা উলকার বেগে বিদ্যুৎগতিতে আমাকে নিয়ে দৌড় দিলো। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছিলাম না। আমার হাত-পা ওপরে-নিচে বাতাসে ঢেউয়ের মতো উঠানামা করছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা নিয়ন্ত্রণহীন বাদুড়। যে নিজের ভারসাম্য ধরে রাখতে সমান তালে তার পাখা নাড়ছিল।

চিন্তা করুন, বিরাট আলখাল্লার মতো বোরকা পরা একজন গাধার ওপরে বসে হাত-পা ছুঁড়ে। আর গাধা ছুটছে দিগ্বিদিক ভুলে...দূর থেকে নিশ্চয়ই আমাকে কিছুতকিমাকার ভূতের মতোই লাগছিল।

গাধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেই না নিচের দিকে ঝুঁকেছি, অমনি আমার বোরকার ভেতর থেকে ক্যামেরা পড়ে গেল। ক্যামেরা তালেবান শাসনে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আমিও তাল সামলাতে না পেরে নিচে পড়ে গেলাম।

নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা তুলে দেখি, একজন ভয়ালদর্শন তালেবান সৈনিক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন...

তিন

আমি যখন লন্ডন ফিরে বান্ধবীদের এই ঘটনা বলেছিলাম, ওরা তখন জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আচ্ছা সেই মুহূর্তে তোমার অনুভূতি কী হয়েছিল? যখন লোকটা তোমার দিকে অমন করে তাকিয়ে ছিল, আর তুমি বুঝে গেলে তোমার খেলা শেষ?’

আমি হেসে বলেছিলাম, ‘মনে হয়েছিল, বাহ! লোকটা তো দেখতে দারুণ আর হ্যান্ডসাম! তার ছিল সবুজ ঝকঝকে চোখ, চকচকে দুটো গাল আর ঘন কালো দাড়ি।’

অবশ্য এমন অনুভূতি ছিল সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য।

আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা থাকায় সে আমার চেহারা দেখতে পায়নি। আমি তার হাতে ক্যামেরাটা দিয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবলাম, এফুনি আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। মনে মনে অপেক্ষা করছিলাম, কখন একটা বুলেট এসে আমার কপাল ফুটো করে দেয়।

কয়েক সেকেন্ড পরে চোখ মেলে লোকটাকে দেখতে পেলাম না। একটু খেয়াল করতেই দেখি, সে অদূরে আমার দুই গাইডের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে আর জিজ্ঞেস করছে, ‘কোন সাহসে ক্যামেরা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে?’

মার খেয়ে গাইডদের একজনের নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। আরেকজন চেষ্টা করছিল পরিস্থিতি সামাল দিতে। তাদের ঘিরে অন্তত শতানেক লোকের ভিড়।

‘এই তো সুযোগ!’ আমি আনন্দচিহ্নে ভাবছিলাম, ‘আমি তো সহজেই সীমান্তঘেঁষা লোকগুলোর সাথে মিশে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে পারি।’ আগেই ঠিক করা ছিল, পরিস্থিতি বেগতিক দেখলে যে যেভাবে পারা যায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

আমি কয়েক পা বাড়িয়েছিলাম। পরক্ষণেই চোখের সামনে গাইডের রক্তাক্ত চেহারা ভেসে উঠল। মনে হলো, ওদের এভাবে পেছনে রেখে আমি পালিয়ে যেতে পারি না। আমার কিছু একটা করা উচিত। আমি সোজা লোকগুলোর ভেতর দিয়ে সেই সৈনিকের কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু লোকেরা আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছিল। ভাবখানা এমন, ‘এই পুরুষ মানুষের কাজ কারবারের ভেতর মহিলাদের আবার কী?’

আমি এবার আমার চেহারা থেকে বোরকা সরিয়ে ফেললাম। চিৎকার দিয়ে বলে উঠলাম, ‘কেউ কি আমাকে যেতে দেবেন?’

সমস্ত কোলাহল থেমে গেল। চারদিকে তখন শূনশান নীরবতা। মনে হলো, একটা পিন পড়ে গেলেও কেউ তার শব্দ শুনতে পাবে।

মুসা ﷺ-এর সময় যেমন নীল দরিয়া দুধারে সরে গিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছিল, লোকেরা তেমনি দুপাশে সরে গিয়ে আমাকে রাস্তা করে দিলো। আমি সোজা চলে এলাম সেই সৈনিকের সামনে। হাত পেতে বললাম, ‘আমার ক্যামেরা কি ফেরত পেতে পারি?’

তার চেহারা হয়েছিল দেখার মতো। চোয়াল নিচের দিকে ঝুলে পড়েছিল, দুচোখ বিস্ফোরিত। নীল নয়না, স্বর্ণকেশী এক পশ্চিমা নারী এভাবে বোরকার আড়াল থেকে বের হয়ে আসবে- এ ছিল তার চিন্তারও অতীত। ভূত দেখলেও বোধ হয় এতটা চমকে যেত না।

আমি মনে মনে ভাবলাম, ‘যাক! সমস্যার সুন্দর সমাধান হয়ে গেল। এখন নিশ্চয় তারা পশ্চিমা কোনো নারীর ওপর হাত তুলবে না। আর আমার গাইড দুজনও বেঁচে যাবে।’ তাকিয়ে দেখি, গাইডদের মুখে রাজ্যের অন্ধকার। ব্যাপার কী? সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমি কি আরও বিপদ ডেকে আনলাম?

একটু আত্মস্থ হতেই সেই সৈনিক গাইডদের দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার দেওয়া শুরু করল। একটু পরে আমাদের তিনজনকে একটা গাড়িতে আলাদা করে তুলল। গাড়ি চলতে শুরু করলে কী নিয়ে যেন তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো। কথার মাঝখানে ড্রাইভার হঠাৎ করে গাড়ি থামিয়ে দিলো। সেই তালেবান সৈনিক আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল এক নির্জন জায়গায়। আমাকে উলটো দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তো অবাক! কী ব্যাপার ব্যাটা গেল কোথায়?

আমি যেখানটায় ছিলাম, তার চারদিকে ছিল অসংখ্য নুড়ি পাথর। আমার সারা শরীর দিয়ে আতঙ্কের হিম স্রোত বয়ে গেল। সর্বনাশ! দেখে মনে হয় এটা কোনো বধ্যভূমি। সেই লোক নিশ্চয় আশেপাশের গ্রামে গিয়ে মানুষদের ডেকে বলছে, একটা পশ্চিমা মহিলা ধরা পড়েছে। দশ মিনিটের মধ্যে তাকে পাথর মারা হবে। কে কে যাবে এসো! আমরা পাথর মেরে তাকে খতম করে দিই।’

আফগানিস্তানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলাম। এই দেখি কোথাও কোনো জনমানুষের চিহ্ন নেই। আবার এই দেখি একগাদা মানুষের ভিড়।

কয়েক মিনিট পরে দেখলাম, একদল ভয়ংকর দর্শন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় অন্তত ৭০-৮০ জনের কম হবে না। তারা আমার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল।

আমার মনে হলো, নিশ্চয় তারা কাছে আসছে নিশানা ঠিক করার জন্য। যাতে পাথর মারলে ঠিকঠাক আমার গায়ে এসে লাগে। আমার বুকের ভেতর তখন একরাশ ভয়, আতঙ্ক। মনে চিন্তার ঝড়, এখান থেকে বেঁচে কি ফিরতে পারব কখনো?

আসলে ব্যাপার ছিল ভিন্ন। আফগানিস্তানে পুরুষের জন্য মাহরাম মহিলা ছাড়া অন্য মহিলাদের চেহারা দেখা ছিল নিষিদ্ধ। তাই আমার মতো একজন পশ্চিমা নারীকে তারা অবাক চোখে দেখছিল। তারা এগিয়ে আসছিল, যাতে আমাকে ভালো করে দেখা যায়। নিজেকে তখন মনে হচ্ছিল, চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দি আজব কোনো প্রাণী।

একটু পরে সেই আফগান সৈনিক বোরকা পরা এক মহিলাকে নিয়ে ফিরে এলো। আমার বোরকা আগেই খুলে গিয়েছিল। পরনে ছিল সালোয়ার আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কামিজ। মহিলা এসে আমার সারা শরীর সার্চ করা শুরু করল।

আমার এতক্ষণের ভয় উদ্বেগ কেটে গিয়ে এবার প্রচণ্ড রাগ লাগছিল। ও! এই তাহলে ব্যাপার! তারা নিশ্চয়ই এখন আমাকে মারবে না। মারলে নিশ্চয় সার্চ করত না। শুধু শুধু এই ভয়ালদর্শন লোকগুলো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আর সৈনিকটা চাইলে নিজেই তো আমাকে সার্চ করতে পারত। যেমনটা ব্রিটিশ পুলিশ করে থাকে। আলাদা করে এই মহিলাকে আনার কী দরকার ছিল?

সত্যি কথা বলতে, আফগান সৈন্যরা অন্তত পশ্চিমাদের চেয়ে অনেক বেশি শালীন আর ভদ্র ছিল।

আমার মেজাজ তখন সপ্তমে। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কামিজ মাথা পর্যন্ত উঠিয়ে তাদের বললাম, ‘এই দেখ! আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। এত সার্চ করার কী হলো?’

‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা...’ মুহূর্তের মধ্যে লোকগুলো সব উলটো দিকে ফিরে দাঁত মুখ খিচে এমনভাবে দৌড় দিলো, যেন ভূতে তাড়া করেছে।

পরে বুঝেছিলাম, আফগানিস্তানে কোনো মহিলার জন্য এমন আচরণ অত্যন্ত অশোভন। বোরকা পরা সে মহিলা আমার গালে থাপ্পড় মেরে বসল। আমার এমন অশালীন, অসভ্য আচরণ দেখে সে মহিলা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

যখন নিশ্চিত হওয়া গেল আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই, তারা আবার আমাকে গাড়িতে তুলে নিল।

এবার গন্তব্য জালালাবাদ। তাদের গোয়েন্দা সদর দফতর।

চার

জালালাবাদ পৌঁছার পর আমি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের মুখোমুখি হলাম। তিনি কিছুটা ইংরেজি বুঝতে পারেন। আমার বিস্তারিত ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে দিতে বললেন। যাতে নিশ্চিত হওয়া যায়, আমি আসলেই সাংবাদিক কি না।

আমি সব লিখে দিলাম।

তখন খাবারের সময় হয়ে এসেছিল। তিনি আমাকে খাবারের টেবিলে আমন্ত্রণ জানালেন, ‘আসুন আমরা খাবার খাই’।

আমি দৃঢ় স্বরে বললাম, ‘আমাকে আগে পরিচিতদের কাছে টেলিফোন করতে দিতে হবে।’

তিনি মাথা নাড়লেন ‘দুঃখিত। এই মুহূর্তে সেটি সম্ভব নয়।’

আমিও অনড় ‘যতক্ষণ না আমাকে ফোন করতে দেওয়া হবে, ততক্ষণ আমি কোনো খাবার স্পর্শ করব না।’

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট, নিষ্ঠুর, বর্বর শাসকগোষ্ঠীর কাছে একজন মহিলার এমন আবেদন-নিবেদন বিশেষ কোনো গুরুত্ব পাওয়ার কথা না। আমি খাচ্ছি কি খাচ্ছি না, তা নিয়েও তাদের কোনো মাথা ব্যথা থাকার কথা নয়।

কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো, আমি খাব না জেনে তিনি খুব হতাশ হলেন। একটু কি খারাপও লাগছিল তার?

আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে একটুও নড়িনি। প্রতিদিন তিনবেলা তারা আমার জন্য খাবার নিয়ে আসত। সামনে পাটি বিছিয়ে দিত। তাতে থাকত রুটি, ভাত ও অন্যান্য খাবার। সাথে এক জগা পানি। তারা আগ বাড়িয়ে আমার হাত ধুয়ে দিত। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে তাদের কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ত, ‘বোন! এমন করে থাকবেন না। আপনি আমাদের বোন, আমাদের অতিথি। আপনি না খেয়ে থাকলে আমরা কষ্ট পাব।’

আমার মনে হতো, পৃথিবী খ্যাত নিষ্ঠুর গোষ্ঠীর এ কেমন আচরণ? তারা কি আমার কথা বুঝতে পারছে না? নাকি এসবই আমার মনটাকে নরম করার জন্য তাদের অভিনয় মাত্র?

সত্যি কথা বলতে, ধারণা করেছিলাম আমার সাথে হয়তো আবু গারিব ও গুয়ান্তানামো বে কারাগারের বন্দিদের মতোই চরম নিষ্ঠুর আচরণ করা হবে। এমনকী ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো পরিস্থিতিরও মুখোমুখি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

এখন ভাবি, আল্লাহকে ধন্যবাদ আমি পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম গোষ্ঠীর হাতে পড়েছিলাম। সুসভ্য আমেরিকানদের হাতে নয়।

তৃতীয় দিন সকালে তারা একজন ডাক্তার নিয়ে এলেন। ডাক্তার ছে টোখাটো মানুষ। জার্মানিতে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি এসে আমার চোখ দেখলেন, নাড়ি দেখলেন। কান, মুখ গহ্বর ভালো করে পরীক্ষা করলেন। আমি ভাবছিলাম, কাউকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়ার আগে যেভাবে ডাক্তাররা পরীক্ষা করেন সব ঠিক আছে কি না, ইনিও বোধ হয় সেভাবেই আমার পরীক্ষা করছেন।

এরপর তিনি প্রশ্নের মাপলেন। একবারের জায়গায় দুবার। তার চেহারা কিছুটা চিন্তিত।

আমি তাকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম, ‘প্রেসার নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। দীর্ঘদিন ধরেই আমার প্রেশার অনেক হাই।’

তিনি মাথা নাড়লেন, ‘আপনার প্রেশার একদম নরমাল।’

যে মানুষের একটু পরে তালেবানের হাতে ফাঁসি হবে, তার প্রেশার স্বাভাবিক হয় কী করে!

তিনি আমার অবিশ্বাসী চাহনি দেখে বললেন, ‘এই যে আপনিই দেখুন’। আমি দেখলাম আসলেই তাই।

আমি বললাম, ‘খুব ভালো। এটা তালেবানের মহত্ব যে তারা আমার প্রেশার ভালো করে দিয়েছে।’

ডাক্তারের এক ছেলে ছিল। নাম হামেদ। সে আমার আর তালেবানের মধ্যে দোভাষীর কাজ করত। পঞ্চম দিন সকালে সে খুব উৎফুল্লচিত্তে আমার কাছে দৌড়ে এলো। তার হাতে জালালাবাদ থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। বলল ‘ম্যাডাম! এই দেখুন। পত্রিকায় আপনার খবর ও ছবি বেরিয়েছে।’

পত্রিকার প্রথম পাতায় রয়টার্স^৫ থেকে নেওয়া আমার দুটো ছবি। প্রথম পাতার অর্ধেকটা জুড়ে লাল কালির বিশাল শিরোনাম। তার নিচে অল্প একটু খবর। মূলত খবরের চেয়ে শিরোনামই কয়েক গুণ বড়ো।

আমি জানতে চাইলাম, ওখানে কী লেখা আছে?

হামেদ আমাকে পড়ে শোনাল সেই শিরোনামে লেখা ‘তালেবান ইভন রিডলির ব্লাড প্রেশার ভালো করে দিয়েছে। আর এজন্য সে খুবই খুশি।’

ষষ্ঠ দিন উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা দলবল নিয়ে আমার রুমে এলেন। তার চেহারা গম্ভীর, ভয় জাগানিয়া। তার নেতৃত্বে আমাকে অনেক রাত পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তারা অবশ্য কখনোই আমাকে শারীরিক নির্যাতনের ভয় দেখায়নি। তারা শুধু আমাকে বলত, তাদের কথামতো কাজ না করলে, তাদেরকে সাহায্য না করলে বছরের পর বছর এখানে বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

আমি ভাবতাম, এই লোকগুলো সম্পর্কে আমি এ যাবৎকাল যা শুনে এসেছি, তাতে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করি আর নাই করি, তারা ঠিক ঠিক তাদের ইচ্ছেমতো কোনো একদিন আমাকে মেরে ফেলবে। তাই ঠিক করলাম, মরতে যখন হবেই তখন আর ভালো আচরণ করে লাভ কী। আমি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তাদের সাথে কথা বলা শুরু করলাম।

হামেদ আমাদের মাঝে দোভাষী হয়ে কথা আদান-প্রদান করত।

আমি যতই উত্তেজিত আর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলতাম, তারা ততই আমার সাথে নরম আচরণ করত। আমাকে বলত, ‘আরে বোন! আপনি এত ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন? আপনি আমাদের বোন, আমাদের অতিথি।’

মাঝে মাঝে তো হামেদ আমাকে বলত, ‘আপনি এত বেশি আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলেন, তা আমি আফগান ভাষায় তাদের কাছে অনুবাদ করতে প্রচণ্ড ভয় পাই।’

একদিন সকালে হামেদ খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমার কাছে লো। তার চোখ-মুখ শুকনো। চেহারায় সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ, ‘আপনার কাছে আজ অত্যন্ত সম্মানিত একজন ভিআইপি গেস্ট আসবেন। দয়া করে তার সাথে সম্মানের সাথে কথা বলবেন। তার সাথে কোনো ধরনের অসভ্য আচরণ করবেন না।’

আমি জানতে চাইলাম ‘কে সেই লোক? কে এমন ভিআইপি যার নাম নিতেও হামেদ ভয় পাচ্ছে? মোল্লা ওমর?’

হামেদ মাথা নাড়ল, ‘একটু পরেই দেখতে পাবেন।’

আমার মনে চিন্তার ঝড়। আমার সাথে দেখা করতে কে এমন আসতে পারে?

আমার ভাবনার মাঝেই দরজার কড়া নড়ে উঠল।

পাঁচ

যদিও আমি ছিলাম বন্দি, কিন্তু দরজার চাবি আমার কাছেই থাকত। তারা দেখা করতে আসলে দরজার কড়া নাড়তেন। আমি ভেতর থেকে খুলে দিতাম।

দরজা খোলার পর যে লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য রক্ত চলাচল গেল বন্ধ হয়ে।

বিগত ছয় ছয়টি দিন আমি ধর্ম নিয়ে আলোচনা সযত্নে এড়িয়ে চলেছি। আর এখন কিনা আমি একজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় গুরু, মাওলানার মুখোমুখি।

আফগান দেশটা ধূলি ধূসরিত মরু অঞ্চল। কিন্তু লোকটার পরনে সুন্দর পরিষ্কার আইভরি রঙের লম্বা আলখাল্লা। লম্বায় মাটি ছুঁই ছুঁই। এতটাই বড়ো, তার পা যেন তার মধ্যে পুরো অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুখে মার্জিত, সুন্দর করে ছাটা ঘন দাড়ি। মাথায় আইভরি রঙের সুন্দর পাগড়ি। চোখ দুটো হালকা বাদামি। চোখে-মুখে ব্যক্তিত্বের প্রখর দীপ্তি। হাতে ছিল তাসবিহ। তিনি অনবরত তাসবিহ জপে চলেছেন।

আরও একটা বিষয় ছিল যা একটু অন্যরকম, একটু অদ্ভুত। তার চেহারায় ছিল আলোর দ্যুতি। যেন ভেতর থেকে আসা কোনো আলোকচ্ছটা তার চোখে-মুখে নাচছে। আমি যখন পরে মুসলিমদের সাথে এই অনুভূতি শেয়ার করি, তারা উত্তর দিয়েছিল, ‘সুবহানাল্লাহ! এটা হলো ‘নূর’, যা পুণ্যবান মানুষদের চেহারা থেকে বের হয়।’

একটু আত্মস্থ হতেই আমি তাকে বসার জন্য অনুরোধ করলাম। ঠিক হাঁটা নয়, তিনি যেন ভেসে ভেসে এসে বসলেন। তার হাতের তাসবিহ তখনো চলমান। মুখে মুচকি হাসি।

তিনি এবার মুখ খুললেন, ‘আপনার ধর্ম কী?’

এইরে, শুরু হয়ে গেল! উত্তর দিলাম, ‘আমি খ্রিষ্টান’।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেমন ধরনের খ্রিষ্টান? রোমান ক্যাথলিক^৬, প্রোটেস্ট্যান্ট^৭, অ্যাংলিক্যান^৮, না ব্যাপটিস্ট?’^৯

‘আমি প্রোটেস্ট্যান্ট।’

‘ইসলাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?’ তার তাসবিহ এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি।

‘ওহ, ইসলাম!’ আমি বলে চললাম, ‘ইসলাম একটা চমৎকার ও অসাধারণ ধর্ম।’

আসলে ইসলাম সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। যেটুকু জানতাম, তাও ভুল-ভাল, মিডিয়া থেকে জানা।

আমি প্রায় দুই মিনিট ধরে ইসলামের বড়োত্ব ও মহত্ত্ব নিয়ে কথা বলে গেলাম।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলেন আর এক মনে তাসবিহ জপে যাচ্ছিলেন।

আমি থামতেই তিনি বললেন, ‘ইসলাম হলো সুন্দরতম ধর্ম।’

‘একদম ঠিক বলেছেন’ আমি আবারও মনের মাধুরী মিশিয়ে ইসলাম নিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলে চললাম। হামেদ আমার কথাগুলোকে পশতু ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছিল।

তিনি আগের মতোই মুচকি মুচকি হেসে তাসবিহ জপে যাচ্ছিলেন।

এখন বুঝি, তিনি হয়তো তখন মনে মনে ভাবছিলেন ‘এই মহিলা আস্ত একটা হাদারাম! জানে না কিছুই, আবার আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।’

আমি কথা শেষ করলে হাসি হাসি মুখে তিনি বললেন, ‘তাহলে আপনি নিশ্চয় এখন ইসলাম গ্রহণ করতে চান?’

আমি দেখলাম, এ তো মহাবিপদ! নিজের ফাঁদে এখন নিজেই আটকা পড়েছি।

যদি এখন ‘হ্যাঁ’ বলি, তাহলে দুদিন পরে এরা আমায় নিয়ে পাথর মেরে হত্যা করবে। বলবে, এই মহিলা ইসলামের কিছুই মানে না। আবার যদি না বলি, তাহলেও আমাকে মেরে ফেলবে। বলবে, তুমি ইসলামের অবমাননা করেছ।

আমার মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল, সুন্দর জবাব কী হতে পারে।

শেষে বললাম, ‘দেখুন! বন্দি অবস্থায় থেকে আমি এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তবে কথা দিচ্ছি, যদি আপনারা আমাকে ছেড়ে দেন, আমি কুরআন পড়ব আর ইসলাম নিয়ে গবেষণা করব।’

তিনি একটি কথাও বললেন না। মুচকি হেসে উঠে দাঁড়ালেন এবং আগের মতোই দৃশ্যত হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেরিয়ে গেলেন। হামেদ তার পেছন পেছন ছুটল।

কয়েক মিনিট পরে হামেদ ফিরে এলো ‘আপনি মুক্তি পেতে যাচ্ছেন। রেড ক্রিসেন্টের একটি প্লেনে করে আপনাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।’

‘ইয়েস!’ আমি তখন আনন্দে আত্মহারা। ‘কী চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে মাওলানাকে কাবু করে আমি মুক্তির পথ বের করে নিয়েছি।’

বেলা গড়ালে কাবুলগামী একটি ট্রাকে চড়ে বসলাম। সাত ঘণ্টার ধূলি ধূসরিত এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে চলার পর আমরা কাবুল পৌঁছালাম। কাবুল থেকে আমাদের গাড়ি এয়ারপোর্ট পার হয়ে সামনের দিকে চলতে লাগল।

আমি ভাবছিলাম, নিশ্চয় তালেবানের হাতে আরও বিদেশি বন্দি আছে। সবাইকে নিয়ে একসাথে রেড ক্রিসেন্টের প্লেনে করে আমরা ফিরে যাব।

সে রাতে আফগান চরিত্রের আরেকটি দিক আমার কাছে পরিষ্কার হলো। আফগানরা সরাসরি কোনো খারাপ খবর আপনাকে দিতে চাইবে না, যাতে আপনি কষ্ট পান। তারা বিষয়টিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করবে।

গাড়ি আমাকে নিয়ে পৌঁছল এক জেলখানার সামনে। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কারাগার যেমন হয়। অন্ধকার, সঁাতসঁাত। একটা রুমে দুজন মহিলা আমাকে অভ্যর্থনা জানাল ‘আজ রাতে আপনি এখানেই থাকবেন।’

‘না না! আপনাদের কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে’, আমি প্রতিবাদ করলাম ‘আমার তো রেডক্রসের প্লেন ধরে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা।’

অবশেষে খারাপ সংবাদটা আমাকে দেওয়া হলো। আমি একজন বিদেশি মহিলা। কোনো পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই এখানে এসেছি। তাই আমাকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে।

‘তোমরা কোনোভাবেই আমার সাথে এ আচরণ করতে পারো না।’ আমি চিৎকার করে বললাম, ‘আমি একজন ব্রিটিশ!’

তারা একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে পাশের রুমের দরজা খুলে গেল। দেখি, হিজাব পরা ছয়জন মহিলা। তাদের একজন আমার দিকে এগিয়ে এলেন ‘আপনি কি রেডক্রসের?’

‘আরে আপনি তো ইংরেজিতে কথা বলছেন!’ আমি অবাক।

‘হ্যাঁ। কারণ, আমি অস্ট্রেলিয়ান।’ তিনি উত্তর দিলেন ‘এই তিনজন জার্মান আর ওই দুজন আমেরিকান।’

‘তার মানে আপনারা তো খ্রিষ্টান, যারা সমাজ সেবামূলক কাজ করেন। মুসলমানদের মাঝে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও ধর্মান্তরণের অপরাধে যাদের আটক করা হয়েছে।’

তারা উত্তর দিলেন, ‘আপনি ঠিক ধরেছেন।’

আমি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বললাম ‘দেখুন তো কাণ্ড! আমাকে রেডক্রসের বিমানে করে দেশে ফেরত পাঠানোর কথা। ভুল করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি এই মহিলাদের সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু তারা কিছুতেই তা বুঝছে না।’

তারা এগিয়ে গিয়ে দুজন আফগান মহিলার সাথে কথা বলা শুরু করলেন। একটু পরে তাদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় আর চেহারার মুখভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম, আমার কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। অন্তত আজ রাতে নয়।

অস্ট্রেলিয়ান তরুণী আমার দিকে এগিয়ে এলেন, ‘আপনি চাইলে আমাদের সাথে একই রুমে থাকতে পারেন।’

আমি রাজি হলাম। বিগত কয়েক দিনের মধ্যে এই প্রথম আমি কোনো নারী সঙ্গী পেলাম। তার ওপর তারা ছিলেন ইংরেজিভাষী। তাদের সাথে কথা বলে আমি হয়তো একটু হালকা হতে পারব।

আমি ওদের সাথে রুমে ঢুকলাম। তৃতীয় বিশ্বের আর দশটা জেলখানার মতোই রুমটা ছিল শ্রীহীন।

হঠাৎ কী হলো জানি না, দারুণ এক অবসাদ আমাকে পেয়ে বসল। আমি নিদারুণ কান্নায় ভেঙে পড়লাম। এ ছিল আমার বন্দি জীবনের প্রথম অশ্রু। মনে হলো, আমার ভেতরের এত দিনকার সব প্রতিরোধ তালেবানরা সফলতার সাথে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

নিজেকে শান্ত করতে আমি সিগারেট ধরাতে চাইলাম। তালেবান শাসনে এমনিতে সিগারেট নিষিদ্ধ। তবে যখন তারা বুঝল আমি সিগারেট খাই, আমাকে বেশ কয়েকটা এনে দিয়েছিল।

গাল বেয়ে তখনো আমার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমি কাঁপাকাঁপা হাতে ঠোঁটের কোণে সিগারেট রেখে লাইটার দিয়ে ধরানোর চেষ্টা করছি। আমি আমার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘আমি একটা সিগারেট ধরালে কিছু মনে করবেন না তো?’

‘অবশ্যই মনে করব’ উত্তর শুনে ধাক্কা খেললাম। ‘এই রুমটা ধূমপান মুক্ত, ধূমপান করতে হলে বাইরে চলে যান।’

পোড়া কপাল আমার! ধূমপানমুক্ত রুমেই কিনা আমার ঠাই হলো! পরক্ষণেই তারা জানালেন, এই রুমে তারা এখন মিটিং করবেন।

‘মিটিং!’ আমি চমকে উঠলাম।

‘হ্যাঁ। আমরা রোজ দুবার মিটিং করি।’

হঠাৎ করে আমার মাথায় অন্য চিন্তা খেলে গেল। ‘দুবার মিটিং! পালানোর কোনো মতলব নেই তো? হয়তো তারা কোনো প্ল্যান করেছেন। এখন আলোচনা করবেন, কী করে প্ল্যান মোতাবেক কাজ করা যায়’।

নিকোটিনের নেশা আমার মাথা থেকে উবে গেল। আমি বেশ উৎসাহ নিয়ে বললাম, ‘আমি কি আপনাদের সাথে থাকতে পারি?’

তারা সম্মতি দিলেন। আমি খুব আত্মহ নিয়ে তাদের কাজ দেখছিলাম। ছয়জন মহিলা গোল হয়ে নিচে বসলেন। একজন তার ব্যাগ থেকে কী একটা বের করলেন।

কী ওটা? এই কারাগারের কোনো স্কেচ; যাতে কী করে পালান যায়?

ছয়

যা দেখলাম, তাতে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ব্যাগ থেকে বের করে আনা বস্তুটি আসলে একখণ্ড ‘বাইবেল’।

অবিশ্বাস্য! যে মহিলাদের ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের শরিয়্যা আইনে বিচার হবে, তারা কিনা তালেবানের জেলে বসে প্রকাশ্যে বাইবেল পড়ছে। আমার মনে হলো, যেকোনো মুহূর্তে তালেবানের প্রহরী বিপুল বেগে ছুটে আসবে আর মহিলাদেরকে আচ্ছাদিত পেটাবে।

কিন্তু না, তেমন কিছুই হলো না।

পরে আমি কুরআন পড়ে বুঝেছিলাম, মুসলিমরা ভিন্ন ধর্মালম্বীদের বিশেষ করে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সম্মান করে। তাদের ধর্ম পালনে কোনো বাধা দেয় না। আর তালেবান ঠিক এই কাজটাই করেছিল। অবশ্য সে সময় আমি তা বুঝিনি। আর বোঝার কথাও নয়।

ছয়জন প্রায় বিশ মিনিট ধরে বাইবেল থেকে পড়ে গেলেন। এরপর হাতে লেখা একটা কাগজ বের করলেন। শুরু হলো ধর্মীয় গীত গাওয়া। আন্তে আন্তে নয়, একেবারে উচ্চস্বরে। খুবই হাসি-খুশি, প্রাণচঞ্চল আর প্রাণবন্ত সে গানের সুরে পুরো রুম যেন গম গম করছিল।

আমি বাইরে এসে পর পর তিনটি সিগারেট শেষ করলাম।

সে রাতে আমি কংক্রিটের ওপর পাতলা মাদুর বিছিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। পরদিন সকালে আমাকে এক প্রস্থ পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো।

তালেবানদের হাতে বন্দি থাকা অবস্থায় কেউ আমাকে ধর্ষণ করেনি। শ্লীলতাহানি করেনি। এমনকী আবু গারিব কারাগারের মতো উলঙ্গ করে চোখ বন্ধ অবস্থায় কেউ আমার ভিডিও করেনি। বুঝতেই পারছেন, আমেরিকানদের হাতে বন্দি মানুষগুলোর চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রুমের বাইরে খোলা চত্বরের একদিকে পানির ব্যবস্থা ছিল। আমি আমার কাপড়-চোপড় ধুয়ে দড়িতে শুকাতে দিলাম। একপাশে বসে আমি তখন আমার পুরোনো দিনের কথা ভাবছি। এমন সময় হস্তদন্ত হয়ে জেলার এলেন। জেলার ছিলেন লম্বা চওড়ায় বিশাল মানুষ। মুখভর্তি ঘন লম্বা দাড়ি। চেহারা যথারীতি গুরুগম্ভীর, ভয়ংকর।

তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বেশ জোরে চোঁচিয়ে বললেন, ‘ওইসব কাপড় সরান।’

আমি বললাম, ‘সমস্যা কী? ওগুলো তো আমার কাপড়। শুকাতে দিয়েছি।’

তিনি আবারও বললেন, ‘ওই কাপড় সরান।’

‘আরে ভাই, সমস্যা কী আপনার? দেখছেন না, আমি কাপড় ধুয়ে শুকাতে দিয়েছি। এখান থেকে সরালে কাপড় কি শুকাবে?’

তিনি আবারও বললেন, ‘ওই কাপড়গুলো ঢাকুন।’

‘লোকটার কী মাথা খারাপ নাকি! বারবার কেবল এক কথাই বলে যাচ্ছে। আরে কাপড় ঢেকে রাখলে শুকাবে কী করে? আজব!’

এবার লোকটি একটা কাপড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ‘ওটা সরান’। মুখ তখনো তার অন্যদিকে ফেরানো।

এতক্ষণে আমি বুঝলাম, তিনি আমার অন্তর্বাসের দিকে ইঙ্গিত করছেন। আমি বললাম, ‘সমস্যা কী? এটা তো মহিলাদের ওয়ার্ড। এখানে কাপড় সরাতে হবে কেন?’

লোকটি রাগ করে বলল, ‘আমি বলছি, সরান।’

আমিও সমান তেজের সাথে বললাম, ‘পারলে আপনি নিজে সরান, নয়তো এখান থেকে ভাগেন!’

আমি ভাবলাম, লোকটা মনে হয় রাগে ফেটে পড়বে। তা নয়, লোকটা হনহন করে বেরিয়ে গেল।

অন্তত পনেরো মিনিট পরে আবার ফিরে এলো। সাথে আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। আমি ভাবলাম, এই লোকগুলোর ওপর দুদিন পরে আমেরিকা এসে বোমা ফেলবে। এটা নিয়ে এদের মধ্যে কোনো বিকার নেই। সামান্য একটা অন্তর্বাস নিয়ে এখানে রীতিমতো পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এসে হাজির।

মন্ত্রী আমাকে অনুরোধ করলেন, ‘দয়া করে আপনি কি এটা সরাবেন?’

আমি উত্তর দিলাম, ‘আচ্ছা, এই মহিলা ওয়ার্ডে আপনারা ছাড়া আর তো কোনো পুরুষ মানুষ নেই। বারবার এটা সরাতে বলছেন কেন? আপনারা চলে গেলেই তো হয়। এটা নিয়ে এত হইচই-বা কেন করছেন?’

তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, ‘মহিলা ওয়ার্ডের ওপরেই তালেবান সৈনিকেরা থাকে। তারা যদি জানালা দিয়ে উঁকি দেয় আর আপনার “ওই” জিনিস তাদের চোখে পড়ে, তবে তাদের মনে পাপ ঢুকবে।’

আমি বললাম, ‘তাদের বলেন, তারা যেন বাইরে না তাকায়। তাহলেই তো ঝামেলা চুকে যায়!’

তিনি বললেন, ‘এটা সম্ভব নয়।’

আমি ভাবলাম, আমেরিকা খামোখাই বি-৫২ বোমারু বিমান নিয়ে আফগানিস্তানের ওপর বোমা ফেলতে আসছে। এত কিছু না-করে এক প্লেন ভর্তি নারী সৈন্য পাঠিয়ে দিত। তারা প্রত্যেকেই তাদের অন্তর্বাস আকাশে-বাতাসে নাড়া দিত। ব্যস! তালেবান সব কই পালাত, তাদের টিকিও খুঁজে পাওয়া যেত না।

আসলে গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে এই মানুষগুলোর মনের পবিত্রতা, চরিত্রের সুন্দর দিকটি যে কারও কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

যাহোক, আমাদের তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকল। কে জিতল, কে হারল, জানি না। ইতোমধ্যে আমার কাপড়-চোপড় সব শুকিয়ে গেল।

৯ম দিনের মাথায় সেই মন্ত্রী আমার এখানে আবার এলেন। সাথে আরেকজন মানুষ। দেখলে মনে হয়, এই মানুষটির পক্ষে ঠান্ডা মাথায় হাসতে হাসতে যে কাউকেই খুন করা সম্ভব।

তারা এসে আমাকে বললেন, ‘আপনাকে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।’

‘যথেষ্ট হয়েছে।’ আমি বিরক্তি মাখা স্বরে উত্তর দিলাম, ‘আপনাদের অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। আর নয়। নতুন করে আমার কিছু বলারও নেই।’

কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা। আবার শুরু হলো তর্ক-বিতর্ক। দুপক্ষের একে অন্যের প্রতি শাপ-শাপান্ত চলল। শেষে আমি মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে এমন দুঃসাহসিক কাজ করে বসলাম, যা আমি জীবনেও করিনি।

আমি সেই তালেবান অফিসারের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিলাম। আমার ভেতরটা এতটাই তেঁতে ছিল।

সে অফিসার দ্রুত চলে গেলেন। পরক্ষণেই, এক নারী অফিসার ছুটে এলেন ‘এ আপনি কী করলেন? আপনার সাহস তো কম নয়! এভাবে একজন অফিসারের মুখে থুথু মেরেছেন! আপনাকে বেত্রাঘাত করা হবে। আপনি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন।’

ঘটনার আকস্মিকতায় আমিও হতভম্ব। ভেবে পাচ্ছিলাম না, আমার কী করা উচিত। মনের ভেতর দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমাকে কি জনসম্মুখে বেত্রাঘাত করা হবে? আল জাজিরা টিভিতে কি তা প্রচার হবে? বেত্রাঘাতের ব্যথা না জানি কেমন!

চিন্তায় আমার মুখ শুকিয়ে আসছিল।

দশ-পনেরো মিনিট পর গেইট খোলার আওয়াজ পেলাম। আমার সঙ্গী খ্রিষ্টান বোন উৎকর্ষিত স্বরে বললেন ‘ওরা ফিরে এসেছে!’

তিন তিনজন খ্রিষ্টান বোন আমাকে আড়াল করে ঘিরে ধরলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন ‘প্রভু যিশু! করুণা করো। ইভন যেন কোনো ব্যথা অনুভব না করে।’

তাতে আমার ভয় বাড়ল বৈ কমলো না। নিজেকে আমি মনে মনে এমন কাণ্ডের জন্য অভিশাপ দিচ্ছিলাম।

শুনতে পেলাম, একটু একটু করে তাদের পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে...।

সাত

খানিক পরেই সেই হাসি মুখের ঠান্ডা মাথার খুনি ফিরে এলেন। তার হাতে সেই জিনিস যার জন্য বিগত নয়টি দিন আমি অনশন করে চলছি।

তিনি হাতে থাকা স্যাটেলাইট মোবাইল ফোন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বললেন, ‘যারা যারা চাও মোবাইল ব্যবহার করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কথা বলতে পারো। কেবল এই ব্রিটিশ মহিলা ছাড়া। সে আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। আমাদের গায়ে থুথু ছিটিয়েছে।’

চিন্তা করা যায়! এই ছিল পৃথিবীর নিকৃষ্ট নিষ্ঠুর শাসকগোষ্ঠীর আমাকে দেওয়া শাস্তি ও নির্যাতনের নমুনা!

ফোন হাতে পেয়ে আমার সাথের মহিলারা খুব খুশি হলেন। মাসের পর মাস তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে কথা হয়নি। এই সুযোগ বলতে গেলে তারা লুফে নিলেন।

আমার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। বলতেই হয়, তালেবানের বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত উন্নতমানের। তারা খুব সূক্ষ্মভাবে আমাকে আহত করতে পেরেছিল।

আমার সাথে এক আমেরিকান বোন এগিয়ে গেলেন সেই হাসি হাসি মুখের মানুষটির দিকে, ‘দেখুন! আজ নয় দিন হলো ইভন এখানে বন্দি। দয়া করে তাকেও একটু কথা বলতে দিন। অন্তত তার মেয়ের সাথে কথা বলুক প্লিজ।’

সেই হাসি হাসি মুখ দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন, ‘উঁহু! সে আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।’

সেদিন বিকেলে কোনো রকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই তালেবানরা আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলল। আমার সমস্ত কাপড়-চোপড়সহ আমাকে দোতলার একটি রুমে নিয়ে এলো। সেখানে একজন সিনিয়র অফিসার থাকতেন। আমার জন্য তা খালি করা হলো। রুমটি আফগানিস্তানের স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ভালোই।

অফিসার আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘আপনি নিচের রুমগুলো নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। আজ রাতে এখানেই থাকবেন। কাল সকালে আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।’

আমি কিছুটা বিরক্তি সহকারে বললাম, ‘সব কথার শেষে কি একটা ‘ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ’ বলেন, কিন্তু কখনোই তা ঘটে না?’

আসলে আমি ইনশাআল্লাহ শব্দের মানে জানতাম না। এখন আমি জানি ‘ইনশাআল্লাহ’ মানে ‘আল্লাহ যদি চান’।

তারা আমাকে রুমে রেখে আমার হাতে চাবি দিয়ে গেল। আমি ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

আমার রুম থেকে কাবুল শহরের বিরাট অংশ দেখা যেত। আমি বিছানায় আধাশোয়া হয়ে জানালা দিয়ে দূরের নয়নাভিরাম পর্বতমালা দেখছিলাম।

মন আমার নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত। ‘কত বারই তো আমাকে বলা হলো, ইনশাআল্লাহ তুমি বাড়ি যাচ্ছ। কিন্তু সেই ইনশাআল্লাহ তো আজও আসেনি। এবারেও কি তাই? তারা কী বুঝে আমাকে খ্রিষ্টান বোনদের থেকে আলাদা করে নিলেন? তাদের আসলে মতলবটা কী? তারা কি সত্যিই আমাকে মুক্তি দেবে? নাকি সকাল হতেই মেরে ফেলবে?’

হঠাৎ আমার খাটটা দুলে উঠল। প্রচণ্ড শব্দে আমার চিন্তার জট ছিঁড়ে গেল। বাইরে তাকিয়ে দেখি, আলোর ঝলকানিতে গোটা আকাশ আলোয় আলোকিত।

বুঝতে পারলাম যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সেই রাতে ইস-মার্কিন জোট পঞ্চাশ টার ওপরে ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করেছিল কাবুলের ওপর।

ক্রুজ মিসাইলের আওয়াজ অন্তত ২০ মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। একটি বোমা এসে পড়ছিল আমাদের জেলখানার আধ মাইলের মধ্যে।

আমি এর আগেও অনেক যুদ্ধের সংবাদ কাভার করেছি। জানি না, এত দিন কেন বিষয়টা খেয়াল করিনি।

সে রাতে এক নতুন উপলব্ধি হলো আমার ‘এমন নির্বিচার বোমা বর্ষণ থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। পালানোর কোনো পথ নেই। এই বোমা নারী-শিশু-বৃদ্ধকে আলাদা করতে পারে না। এই বোমাতে যেমন শাসকগোষ্ঠী মরবে, ঠিক তেমনি মুহূর্তেই বেসামরিক অতি সাধারণ নারী-পুরুষ-শিশুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হতে পারে ব্রিটিশ কোনো বোমার আঘাতে এই আমি ব্রিটিশ নাগরিকও মারা পড়েছি। টনি ব্লেয়ার হয়তো সব দায়ভার চাপাবে তালেবানের ঘাড়ে। ব্যস! মিটে গেল সব।’

আমি সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিলাম। ভাবলাম, ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধ। এখন আর আমাকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো কারণই নেই।

পরের দিন সকালে আমার দরজার কড়া নড়ে উঠল।

আমাকে বলা হলো, ‘আপনি জলদি আসুন। আপনার জন্য নিচে গাড়ি অপেক্ষা করছে। আপনাকে পাকিস্তান পৌঁছে দেওয়া হবে।’

আমি এক বিন্দুও বিশ্বাস করিনি।

নিচে নেমে দেখি, আসলেই একটা গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি গাড়িতে চড়ে বসলাম। জালালাবাদ হয়ে আমার গাড়ি এসে পৌঁছল পাকিস্তান সীমান্তে।

আমাকে পাকিস্তানি সীমান্ত রক্ষীদের হাতে হস্তান্তর করে দেওয়া হলো।

আমি যখন ‘নো ম্যাস ল্যান্ডে’ এসে পৌঁছালাম, মুহূর্মুহু ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। অসংখ্য সাংবাদিক আমার দিকে ছুটে এলো ‘আপনার সাথে তালেবান কেমন আচরণ করেছিল?’

আমি এক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপর মুখ খুললাম, ‘অত্যন্ত সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ।’

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম আমার উত্তরে ভীষণ হতাশ হলো। তারা এমন কিছু মোটেও আশা করেনি। তারা চাইছিল ‘আবু গারিব’ টাইপের কিছু একটা। তাদের প্রত্যাশা ছিল, আমার দুই গালে থাকবে আঘাতের চিহ্ন। দুচোখে থাকবে অশ্রুধারা।

তারা ভেবেছিল, আমি এসে বলব ‘আমার সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে, আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে কিংবা আমাকে অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে পেটানো হয়েছে।’

আফসোস! সেরকম কিছুই হয়নি। সত্যি কথাটাই আমাকে বলতে হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, কিছু মানুষের জন্য এই সত্যটা হজম করা কঠিন।

দু সপ্তাহ পরে আমি লন্ডন ফিরে এলাম। একদিন আমার পাকিস্তানি গাইড পাশা আমাকে ফোন করল, ‘ম্যাডাম! জালালাবাদের সেই ছোটো গ্রামটির কথা কি আপনার মনে আছে? সেই গ্রামটি বোমার আঘাতে পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।’

আমি সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললাম, ‘দেখ পাশা! যুদ্ধ যখন চলে তখন এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে যাঠেকানো যায় না। এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।’

পাশা উত্তর দিলো, ‘ম্যাডাম! টানা তিন দিন ধরে যখন একটা গ্রামের ওপর নির্বিচারে বোমা ফেলা হয়, তখন আপনি তাকে দুর্ঘটনা বলেন কী করে?’

আমার কাছে এর কোনো জবাব ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম, ইচ্ছে করেই বেসামরিক লোকদের টার্গেট করে নির্বিচারে বোমা ফেলা হচ্ছে। যাতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গাও সে বোমার বাইরে না থাকে।

অবশ্য এর কিছু দায় তালেবানেরও ছিল।

যুদ্ধ শুরুর পরপরই তালেবান সকল পশ্চিমা সাংবাদিকদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। সাংবাদিক যে দেশেরই হোন না-কেন, তাদেরকে তাদের মতো করেই তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। পশ্চিমা সাংবাদিকরা না থাকাতে গোটা বিশ্ব বুঝতেই পারেনি, নির্বিচারে বোমা মেরে ইঙ্গ-মার্কিন জোট কী পরিমাণ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।

এই ঘটনা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমি যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠলাম।

একই সময়ে তালেবানকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল। তারা তাদের কথা রেখেছে। আমাকে নিরাপদে মুক্তি দিয়েছে। আমি তো কথা দিয়েছিলাম, মুক্তি পেলে আমি কুরআন পড়ব। ইসলাম নিয়ে গবেষণা করব।

এবার আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার পালা।

আট

আমি কুরআন পড়া শুরু করলাম।

কিছু মুসলিম আমার এই কুরআন পড়ার কথা জানতে পারল। তাদেরই একজন আমাকে দিলেন আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলির ইংরেজি অনুবাদ। এই অনুবাদের শেষের দিকে ইনডেক্স দেওয়া ছিল। এই যেমন; নারী বিষয়ে কুরআনে কোথায় কী বলা হয়েছে, আল্লাহ সম্পর্কে কী আছে, নবি, ফেরেশতা ও পরকাল সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য কী, ইত্যাদি।

ভাবলাম, যাক ভালোই হলো। খুব সহজেই নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব। আমি প্রথমে ভাবলাম, নারী সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়া যাক। দেখা যাক, কুরআন নারীদের সম্পর্কে কী বলে? বিশেষ করে কুরআন কীভাবে নারীদেরকে পুরুষদের অধীনস্থ করে রাখতে, অবদমিত করে রাখার কথা বলে?

আমি নারী সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়া শুরু করলাম। পাশাপাশি এ সম্পর্কে আরও ভালো করে বোঝার জন্য ইসলামিক বই-পত্রও হাতের কাছে রাখলাম।

অবিশ্বাস্য! আমি যা পেলাম, বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। কুরআন কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে, আল্লাহর কাছে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ একই মর্যাদার এবং একই কাতারের।

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন একজন নারী (হজরত খাদিজা রা.)। ইসলামের পথে প্রথম শহিদও ছিলেন একজন নারী (হজরত সুমাইয়া রা.)। ইসলামের প্রথম দিন থেকেই নারীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছিলেন। এমনকী পুরুষদের পাশাপাশি তারা যুদ্ধও করেছিলেন।

উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন, ‘আমি আমার সামনে পেছনে যেকোনো তাকাচ্ছিলাম, দেখলাম এক নারী বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে আমাকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন।’

বুঝতে পারছিলাম না, ইসলামে নারীরা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত...এই ধারণা আমরা কোথায় পেলাম? কে আমাদের মনে এই বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে? আমি তো কোথাও এমন কিছু খুঁজে পেলাম না। শিক্ষা, সম্পত্তি, তালাক সব ক্ষেত্রেই নারীর অংশ আছে, আছে অধিকার। আজ আমরা নারী অধিকারের কথা বলি। দৃশ্যত মনে হয়, আধুনিক নারীদের আইন-কানুনগুলো যেন ইসলামিক আইনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

আমি ইসলামকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা শুরু করলাম। আমার মনে হলো, ইসলাম ও নারী সম্পর্কে জানা হলো, এবার দেখা যাক মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষগুলো কেমন? বিশেষত নারীরা।

আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছি সেটা হোক পাকিস্তান, সৌদি আরব, কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড... আমি মুসলিম বোনদের পেয়েছি বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন যোগ্যতার অধিকারী হিসেবে।

কয়েক বছর আগেও হিজাবধারী কোনো মহিলাকে দেখলে আমার করুণা হতো। মনে হতো, আহা বেচারি! কত নির্যাতিত আর পরাধীন অবস্থার ভেতরেই না আছে! ঘর থেকে বাইরে আসতে তাদের কী কষ্টই না করতে হয়েছে!

এখন আমি হিজাবধারী বোনদের দেখলে বোঝার চেষ্টা করি, এদের মধ্যে কে ডাক্তার, কে ইঞ্জিনিয়ার? কে আইনজীবী, কে শিক্ষক? কে পিএইচডি করছেন, কে এমফিল করছেন? কে তার পেশার পাশাপাশি তার পরিবার, সমাজ গড়াতে সময় দিচ্ছেন? আমি এখন আর তাদের বাহ্যিক পোশাক দিয়ে বিচার করি না। ভাবি, পর্দার আড়ালের মানুষটি আসলে কেমন।

আমার মনে আছে, কানাডার এক বোন আমাকে বলেছিলেন, ‘Yvonne, My head might be covered, but mind is not.’ (ইভন! আমার মাথা ঢাকা থাকতে পারে, কিন্তু আমার মন-মনন-চিন্তা অবরুদ্ধ নয়, স্বাধীন।’) আমি তার কথায় এক বিশাল শিক্ষা পেয়েছিলাম।

মুসলমানদের আরেকটা বিষয় খুব চমৎকার। তাদের রয়েছে চমৎকার সামাজিক বন্ধন।

যাহোক, তখনো আমি শাহাদাহ উচ্চারণ করিনি। ইসলাম নিয়ে গভীর পড়াশোনা করছিলাম। যদিও বাজারে জোর গুঞ্জন ছিল, আমি বোধ হয় ইসলাম কবুল করেছি।

একদিন আমার কাছে একটা ফোন এলো ‘সিস্টার ইভন! আপনাকে ইসলামে স্বাগতম।’ তিনি ছিলেন প্রিন্সটোনের চরম মতাদর্শী ইমাম, আবু হামজা আল মাসরি।^{১০}

আমি উত্তর দিলাম, ‘আপনাকে ধন্যবাদ। তবে আপনার ধারণা সঠিক নয়। আমি এখনো শাহাদাহ উচ্চারণ করিনি। আশা করি ইনশাআল্লাহ স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিতে পারব।’

তিনি বললেন, ‘সমস্যা নেই বোন। আপনি আপনার মতো করে সময় নিন। ভালোমতো অধ্যয়ন করুন, জানুন, বুঝুন। ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত। আমরা আপনার জন্য দুআ করি, যাতে আল্লাহ আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন। আপনাকে হিদায়াত দেন।’

আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না, তিনি এই ভাষায় কথা বলছেন। এক চোখে পট্টি বাঁধা এই ইমামের বদনামের শেষ ছিল না। ট্যাবলেট পত্রিকাগুলো ছিল তার নানা কেছা কাহিনিতে ভরপুর।

আমি উত্তরে বললাম, ‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি সময়ে সময়ে আমার অগ্রগতি সম্পর্কে আপনাকে জানাব’— আমি ফোনটা রেখে দিচ্ছিলাম।

তিনি বললেন, ‘এক মিনিট! শুধু একটা বিষয় আপনাকে বলতে চাই। আপনি যদি আগামীকাল বাইরে বের হন, আর মুসলিম হওয়ার আগে কোনো বাসের নিচে চাপা পড়ে মারা যান’... তার কণ্ঠ এবার মেঘের মতো গর্জে উঠল ‘তাহলে আপনার জায়গা হবে...সোজা জাহান্নামে!’

‘ধন্যবাদ!’ আমি ফোনটা রেখে দিলাম। ভেতরে ভেতরে আমার খুব নার্ভাস লাগছিল। আমি জলদি শাহাদাত পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম।

অবশেষে ২০০৩ সালের ৩০ই জুন, সকাল ১১ : ৩০-এ আমি আমার শাহাদাহ উচ্চারণ করলাম, ‘আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।’ আমি যোগ দিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে আপন এক বিশাল পরিবারে।

আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমি থাকি না কেন, আমার মুসলিম ভাই-বোনেরা আমাকে আপন করে নেবেন।

পরিচিতি

ব্রিটিশ সাংবাদিক ইভনের জন্ম ২৩ই এপ্রিল ১৯৫৮ ইংল্যান্ডের ডারহামে। তাঁর পেশাগত জীবন শুরু হয় Stanley News পত্রিকার মাধ্যমে। এরপরে তিনি The Sunday Times, The Independent on Sunday, The Observer, the Daily Mirror সহ বিশ্ববিখ্যাত বেশ কয়েকটি পত্রিকায় রিপোর্টার ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালে টুইন টাওয়ারে হামলার পর তিনি আফগানিস্তানে ছদ্মবেশে প্রবেশ করেন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। এক পর্যায়ে তালেবানের হাতে তিনি বন্দি হন। তাঁর বন্দি হবার খবরে সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। তাঁর প্রতি তালেবানদের মার্জিত ব্যবহার তাকে ইসলাম নিয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। একসময় ইসলাম নিয়ে গভীর অধ্যয়ন শেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

পরবর্তী জীবনে তিনি ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন সহ বিভিন্ন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। বিভিন্ন মিডিয়া, প্রচার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সোচ্চার হন। তালেবানের হাতে বন্দি হওয়া ও তার আগে-পরের সময়কাল নিয়ে তাঁর লেখা বই *In the Hands of Taliban* সারা বিশ্বে দারুণ আলোচিত হয় ও সাড়া ফেলে। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে আরও আছে *Ticket to Paradise*, *Torture-Does it work?* ইত্যাদি। ওপরে বর্ণিত কাহিনি ২০০৩ সালে নিউজিল্যান্ডে দেওয়া এক বক্তৃতার রূপান্তর।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জননী।

পাদটীকা

১. খাইবার পাস : আফগান পাকিস্তান সীমান্তের বিখ্যাত গিরি উপত্যকা ও পথ। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৩ মাইল। সমুদ্র পৃষ্ঠের ৬০০-১০০০ ফুট ওপরের এই বিশাল পাহাড়ি রাস্তা আফগানিস্তানের কাবুলের সাথে পাকিস্তানের পেশোয়ারকে যোগ করেছে। একসময় খাইবার পাস ঐতিহাসিক সিল্ক রোডের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।
২. নো ম্যানস ল্যান্ড : নো ম্যানস ল্যান্ড বলতে বোঝায়, বিবাদমান দুটো পক্ষের মধ্যকার এমন একটি স্থান, যার ওপরে আসলে কোনো পক্ষেরই নিয়ন্ত্রণ নেই। সাধারণত দুটো পক্ষ যখন একে অপরের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন দু-পক্ষের মাঝে এমন কিছু স্থান থাকে, যেটি অতিক্রম করা কিংবা তাতে অবস্থান করাটাকে দু-পক্ষই ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে। দুটি পক্ষই এমন এলাকায় অবস্থান করা থেকে বিরত থাকে। বিরোধপূর্ণ অনেক সীমান্তেই এমন ‘নো ম্যানস ল্যান্ড’র দেখা মেলে।
৩. পশতু : আফগানিস্তানের অন্যতম জাতীয় ভাষা। দেশের প্রায় শতকরা ষাট ভাগ মানুষ পশতু ভাষায় কথা বলেন। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫% মানুষের মাতৃভাষা পশতু।

৪. মোল্লা উমর : পুরো নাম মোল্লা মুহাম্মাদ উমর। তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের প্রধান রাষ্ট্রনায়ক ও অন্যতম প্রধান ধর্মীয় নেতা। ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। ২০১৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫. রয়টার্স : বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম। ইংল্যান্ডের লন্ডনে এর সদর দপ্তর।

৬. রোমান ক্যাথলিক : খ্রিষ্ট ধর্মের সুপ্রাচীন শাখা। পৃথিবীব্যাপী প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুসারী। ইতালির রাজধানী রোমের ভেতরে ছোট্ট এক রাষ্ট্র ‘ভ্যাটিক্যান সিটি’। ভ্যাটিক্যান সিটির চার্চের যিনি প্রধান, তার উপাধি হলো ‘পোপ’। বিশ্বব্যাপী ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের তিনিই প্রধান আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় গুরু।

ক্যাথলিকদের বাইবেলে মোট ৭৩ টি অধ্যায়। ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করে আদি ও অবিনশ্বর ঈশ্বর একজনই। কিন্তু তিনটি রূপে তার প্রকাশ; স্বর্গীয় পিতা, পুত্র তথা যিশু এবং পবিত্র আত্মা। ক্যাথলিকরা মনে করে ধর্মীয় বিধান মানার ক্ষেত্রে চার্চ এবং বাইবেলের বাণী দুটোরই সমান গুরুত্ব আছে। ক্যাথলিক ধর্ম মতে চার্চের প্রধান পুরোহিতরা হবেন পুরুষ এবং অবিবাহিত। তাদের মতে পোপ হলেন নিষ্পাপ ও সকল পাপমুক্ত। পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই তিনি সব সিদ্ধান্ত নেন। তাই পোপের কথাই আইন, তিনি সমগ্র চার্চের প্রতিনিধিত্ব করেন। ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করে চার্চের প্রধান পাদ্রি কিংবা পুরোহিতের কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার করে নিলেই, পাপ মার্জনা হয়ে যায়।

৭. প্রোটেস্ট্যান্ট : প্রায় ৯০ কোটি মানুষের এই ধর্মমত খ্রিষ্ট ধর্মের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা। ক্যাথলিকদের সাথে এই মতের প্রধান পার্থক্য চার্চের কতৃৎ নিয়ে। প্রোটেস্ট্যান্টরা চার্চ ও চার্চের পাদ্রিদের অদ্রাস্ত ও ঐশ্বরিক মনে করেন না। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক, খ্রিষ্টীয় পণ্ডিত মার্টিন লুথারের হাত ধরেই এই মতবাদের জন্ম। প্রোটেস্ট্যান্টদের বাইবেলে অধ্যায়ের সংখ্যা ৬৬টি। প্রোটেস্ট্যান্টরা বিশ্বাস করেন, বাইবেলই ধর্মীয় আইনের একমাত্র উৎস। চার্চ কিংবা গীর্জার পুরোহিতের এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। তারা মনে করেন, চার্চের কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার করলেই পাপের মার্জনা হয় না। মানুষের মুক্তি মিলবে তার বিশ্বাস ও কাজের ওপরে।

৮. অ্যাংলিকান : এরা মূলত চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট মতের অন্য একটি ধারা।

৯. ব্যাপটিস্ট : ব্যাপটিস্টরাও প্রোটেস্ট্যান্টদের আরেকটি ধারা। তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তাদের অনেকেই আছেন যারা মদ, জুয়া, নাচ-গান ইত্যাদিকে খারাপ চোখে দেখেন। এগুলো বাদ দিয়ে শুদ্ধ জীবনযাপনের কথা বলেন। তাদের আলাদা চার্চ আছে।

১০. আবু হামজা আল মাসরি : মিসরে জন্ম নেওয়া আবু হামজা ছিলেন ফিসবুরি পার্ক মসজিদের ইমাম। তিনি বসনিয়াতে সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর এক হাত ছিল কাটা, এক চোখ নষ্ট। ছাত্র হিসেবে ব্রিটেনে এসে সেখানেই ইঞ্জিনিয়ারিং সমাপ্ত করেন। বিধর্মীদের ওপর আক্রমণ, বোমাবাজি ইত্যাদিকে সমর্থন করে কুখ্যাতি অর্জন করেন। বিবিসিসহ অনেক আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম তাকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রচার করে। ২০০৪ সালে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ১১ টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তিনি বর্তমানে ব্রিটেনের জেলে বন্দি আছেন।

মক্কার পথে

মুহাম্মাদ আসাদ

আমার নাম মুহাম্মাদ আসাদ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল লিওপোল্ড লুইস। পোল্যান্ডের এক ইহুদি পরিবারে আমার জন্ম। আমার পরিবারের অতি প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল। দাদা ছিলেন বংশ পরম্পরায় একজন রাব্বি। আপনারা হয়তো জানেন, ইহুদিদের ধর্মীয় পণ্ডিতকে বলা হয় ‘রাব্বি’। অর্থাৎ একজন ইহুদি মোল্লা।

দাদা আমার বাবার জন্মের পরপরই ঠিক করে ফেলেন, বাবাও হবেন একজন রাব্বি। কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের পরিবারে এমনটাই চলে আসছিল। বাবাকেও পরবর্তী রাব্বি বানানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু বাবা ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক। ওনার ইচ্ছা ছিল পদার্থবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা নেওয়া। দাদা ছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার ঘোরবিরোধী। তার মতে বিজ্ঞান শিক্ষা এক জাহেলি শিক্ষা। এই শিক্ষা গ্রহণ করলে বিধর্মী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তবে আমার বাবা হাল ছাড়ার পাত্র নন। তিনি দিনের বেলা ‘তালমুদ’ পড়তেন এবং রাতের বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে সাধারণ শিক্ষার কারিকুলামের বই পড়তেন। আমার দাদি এ বিষয়টা জানতেন। তিনি আমার বাবাকে এ ব্যাপারে সাহায্যও করেছেন। আট বছরের মাধ্যমিক কোর্স বাবা মাত্র চার বছরে শেষ করে বিএ পরীক্ষা দেন এবং পাস করেন। ডিগ্রি পাওয়ার পরও বাবা ও দাদি খবরটা দাদাকে বলার সাহস পাচ্ছিলেন না। অবশেষে অনেক কসরত করে দাদাকে তারা ব্যাপারটি জানালেন। অনেক অনুরোধের পর দাদা কিছুটা নরম হন এবং বাবাকে উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার অনুমতি দেন। ঠিক হলো, তাকে আর রাব্বির পড়াশোনা করতে হবে না।

কিন্তু অর্থের অভাবে আমার বিজ্ঞানমনস্ক বাবার পক্ষে পদার্থবিজ্ঞান পড়া সম্ভব হয়নি। এজন্য তিনি অধিক আয় করতে পারবেন ভেবে ব্যারিস্টারি অধ্যয়ন করেন।

এরপর বিয়ে করেন আমার মাকে। আমার মায়ের জন্ম হয়েছিল এক ধনী ব্যাংকার পরিবারে। বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে আমি ছিলাম দ্বিতীয়।

আমি সাধারণ স্কুলে পড়ালেখা করেছিলাম। আমাদের পরিবারের ধর্মীয় ঐতিহ্য ছিল বিধায় সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়েও আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তবে আমার মা-বাবা খুব বেশি ধর্ম সচেতন ছিলেন না। মূলত সে সময় দুই শ্রেণির লোক দেখা যেত। এক শ্রেণি হচ্ছে, যারা শুধু অভ্যাসবশত ধর্মীয় নিয়মকানুন পালন করত। আরেক শ্রেণি ছিল, যারা মনে করত

ধর্ম হচ্ছে একধরনের কুসংস্কারের মতো। মাঝে মাঝে সংস্কৃতির নামে এর কিছু নিয়ম মানা যায়, কিন্তু বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে তা মানার প্রশ্নই উঠে না; বরং তারা মনে মনে এ নিয়ে কিছুটা লজ্জা অনুভব করত।

ওপরের দুই শ্রেণির মধ্যে আমার মা-বাবা ছিলেন প্রথম শ্রেণির মানুষ। যারা পারিবারিক ঐতিহ্য থাকার কারণে একরকম অভ্যাসবশত ধর্মীয় নিয়মকানুন পালন করতেন। কিন্তু ধর্ম অনুসারে জীবন পরিচালনা করা বা নৈতিক চিন্তা গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই তাদের ছিল না। তাদের মাথায় এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তাও আসেনি।

তবে পারিবারিক ঐতিহ্য থাকার কারণেই আমাকে অনেক সময় নিয়ে ইহুদি ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হতো। একজন শিক্ষক নিয়মিত বাসায় এসে আমাকে হিব্রু ভাষায় ধর্ম শিক্ষা দিতেন। তেরো বছর বয়সেই আমি হিব্রু ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতাম। এ ছাড়া শিখে ফেলি সুরিয়ানি (Arameich) ভাষা। হিব্রু ভাষার সকল ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেই সম্যক ধারণা পেয়েছিলাম। অনেক ছোটো বেলাতেই আমি তালমুদ ও ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্পূর্ণ পড়ে ফেলি।

এ ছাড়া তালমুদের মূলপাঠ এবং এর তাফসির অর্থাৎ, ‘মিশনা’ ও ‘জেমারা’ও পড়ে ফেলি। এমনকী জেরুজালেম এবং ব্যাবিলনের তালমুদের পার্থক্যগুলো নিয়ে আমি অবলীলায় আলোচনা করতে পারতাম। আমি এত আগ্রহ নিয়ে তালমুদ শিখতাম যে, মনে হতো আমিও যেন আমার পূর্বপুরুষদের মতো একজন ‘রাব্বি’ হয়ে যাব।

তবে ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের কারণে, তালমুদের অসংগতি ও ভুলগুলো খুব দ্রুত আমার চোখে পড়ে। ফলে ইহুদি ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে আমি হতাশ হয়ে পড়ি। যদিও ইহুদি ধর্মগ্রন্থগুলোর নৈতিক ও সংকাজগুলো সম্পর্কে আমার

কোনো মতবিরোধ ছিল না। নবিদের সম্পর্কেও আমার কোনো অবিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আমার মনে হতো ওল্ড টেস্টামেন্টে শুধু বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন পূজারি কীভাবে পূজা-অর্চনা করবে।

আরও যে বিষয়টি আমার খটকা লাগত সেটা হচ্ছে, গ্রন্থটির বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ যেন শুধু ইবরাহিমের বংশধর বা ইহুদি জাতির স্রষ্টা। তিনি যেন শুধু ইহুদিদের নিয়েই ব্যস্ত। গোটা সৃষ্টি বা মানবজাতিকে নিয়ে আল্লাহর কোনো চিন্তা ও পরিকল্পনা নেই।

মনে হচ্ছিল আল্লাহ একটি উপজাতির দেবতা। তাঁর উপজাতিটি যদি সৎ কাজ করে তবে তাদেরকে দেশ জয়ের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। আর যদি তারা কোনো অন্যায় করে, তবে যুদ্ধে হারিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। এ ছাড়া পৃথিবীর বাকি সৃষ্টিদের নিয়ে আল্লাহর কোনো আগ্রহ নেই।

আমি ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। সে সময় আমি অন্য ধর্মগুলো সম্পর্কেও জানার কোনো চেষ্টা করিনি। ধর্মসংক্রান্ত ভাবনা ছেড়ে আমি এক আধুনিক জীবনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের মানুষদের ভেতরে কোনো ধর্মীয় মূল্যবোধ ছিল না। ধর্ম তখন শুধু একটা নামসর্বস্ব প্রথা ছিল। তরুণদের সামনে সে সময় কোনো নৈতিক মূল্যবোধ ছিল না। একসময় আমারও মনে হতে থাকে, আল্লাহ নেই। আমি আধুনিক জীবনযাপন শুরু করি। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাও আমাকে দিন দিন হতাশ করে তুলছিল। এখানে জীবনের মানে হলো, আরাম-আয়েশ, মাস্তি-ফুর্তি। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য যেন শুধু ধনী হওয়া। আরও মনে হতো, মানুষ যেন এক অপূর্ণ যান্ত্রিক জীবনযাপন করছে।

আধুনিক জীবনের হতাশা থেকে কিছুদিন আমি কমিউনিজম নিয়ে পড়ালেখা শুরু করলাম। সে সময় চলছিল কমিউনিস্ট বিশ্বাসের জয়জয়কার। কমিউনিস্টরা একটা সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখাত। কিন্তু সেটিও আমার আগ্রহকে বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। কারণ, মনে হতো এরা শুধু বাহ্যিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্যা এবং ত্রুটি খুঁজে বের করে তার সমাধান দিচ্ছে। কোনো নির্দিষ্ট মৌলিক মূল্যবোধ এদের নেই। এ ছাড়া তারা সবকিছু বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করে। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, নৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া বিজ্ঞান এক ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার। যা আমাকে সমাজ নিয়ে আরও চিন্তিত করে তুলত।

আমি এই ভোগবাদী সমাজের পরিবর্তন চাইতাম। মনে মনে ভাবতাম, এর সমাধান কী? তবে আমার চিন্তার জগৎ শুধু ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর সমাধানও আমি ইউরোপের সংস্কৃতির মধ্যেই খুঁজছিলাম।

কিন্তু এর বাইরেও যে সমাধান থাকতে পারে, তা কখনো আমার মাথায় আসেনি। আর ইসলাম সম্পর্কে তো তখন আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না।

আমি ছিলাম খুবই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। একসময় আমি শিল্পসাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। এজন্য পড়ালেখা শুরু করি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে। কিছু দিন যেতে না যেতেই তাতেও আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। কারণ, সেখানে শিক্ষকরা শুধু সাহিত্যের রূপ-রস নিয়ে আলোচনা করতেন। তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ে খুব বেশি একটা কথা বলতেন না।

আসলে আমি কোনো কিছুতেই স্থির হতে পারছিলাম না। সবকিছুর অসংগতিগুলোই শুধু চোখে পড়ছিল। সে সময় সমাজের বিভিন্ন প্রশ্ন প্রতিনিয়ত আমার ভেতরকে জর্জরিত করত। কোনো কিছুরই স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এ অবস্থায় আমি পড়ালেখার প্রতিও আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম।

আমার বাবার স্বপ্ন ছিল আমি পিএইচডি করব। কিন্তু সে সময় আমি নিজের মধ্যে এক লেখক সত্তা আবিষ্কার করি। আমি সিদ্ধান্ত নিই সাংবাদিকতা করব। স্বাভাবিকভাবেই বাবা এতে মনঃক্ষুণ্ণ হন। আসলে আমার সে সময়কার অস্থির অবস্থার কথা আমি কাউকে বোঝাতে পারছিলাম না। প্রতিনিয়ত আমি যেন কিছু একটা খুঁজছি। কিন্তু কী খুঁজছিলাম, তা আমি নিজেও জানতাম না।

পড়ালেখা ছেড়ে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে সাংবাদিক হওয়ার চেষ্টা করার কারণে আমাকে প্রচুর অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে হয়। সে সময় আজকের মতো এত সংবাদপত্র ছিল না। ফলে যেকোনো বড়ো সংবাদপত্রে চাকরি পাওয়া ছিল অনেক কষ্টের। কিছুদিন এক সিনেমার পরিচালকের সহকারী হিসেবে কাজ করেছি। জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন জায়গায় করেছি অস্থায়ী কাজ। এতটাই অর্থনৈতিক কষ্টে পড়েছি যে, মাঝে মাঝে দিন কেটেছে শুধু চা আর বাড়িওয়ালির দেওয়া দুই টুকরো রুটি দিয়ে।

অবশেষে আমি এক পত্রিকায় কাজ পেলাম। তবে তা সামান্য টেলিফোনিস্টের কাজ। যা আমার উচ্চাশার তুলনায় ছিল খুবই হতাশাজনক। কিন্তু অর্থনৈতিক কষ্টের সেই সময় ওই কাজ ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না। ভাগ্যক্রমে আমি ধীরে ধীরে টেলিফোনিস্ট থেকে সেই পত্রিকার রিপোর্টার পদে উন্নীত হই। এভাবে আমার সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়।

তবে তখনও আমার মনের ভেতরের অস্থিরতা কমেনি। আমি শুধু মানুষের জীবনের মানে খুঁজতাম। খুঁজতাম এই মানসিক অবস্থার সমাধান।

হঠাৎ একদিন আমার মামা ডোরিয়ানের কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পাই। তিনি ছিলেন আমার মায়ের সবচেয়ে ছোটো ভাই। জেরুজালেমের একটি মানসিক হাসপাতালের তিনি প্রধান ছিলেন। তিনি ইহুদি হলেও ইহুদি ধর্ম পালনের প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না; বরং আরবদের প্রতি তার এক ধরনের দুর্বলতা ছিল। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। এজন্য সেখানে খুব একাকিত্ববোধ করতেন।

তিনি চিঠিতে জেরুজালেমের সৌন্দর্যের বর্ণনা করে, আমাকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনি চাচ্ছিলেন, আমি তার কাছে গেলে তার একাকিত্ব দূর হবে।

আমি কিশোর বয়স থেকেই ছিলাম উদ্বেজনা ও ভ্রমণপ্রিয়। তাই তার এই আমন্ত্রণ পেয়ে আমি আর অপেক্ষা করিনি। আমি সিদ্ধান্ত নিই, জেরুজালেম যাব। পরদিন সকালেই পত্রিকা অফিসে জানিয়ে দিই, এক সপ্তাহের জন্য আমি জেরুজালেম যাচ্ছি।

তখন পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আরব বলতে তখন আমার জ্ঞান শুধু আরব্য কিছু রোমান্টিক উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমার ধর্মীয় জ্ঞান ছিল শুধু ইউরোপের দুটো প্রধান ধর্ম ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মকে ঘিরেই। ইসলামকে এদের সাথে তুলনা করার কথা চিন্তাও করতে পারতাম না।

ডোরিয়ান মামার আমন্ত্রণে আমি জেরুজালেমের পথে যাত্রা শুরু করি। বলা চলে সেইসাথে ইসলামের পথেও আমার যাত্রা শুরু হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে আরবমুখী জাহাজে উঠে বসলাম। জাহাজে করে কয়েক দিন পর নামলাম আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখান থেকে ট্রেনে করে যেতে হয় ফিলিস্তিনে।

যাত্রা পথে ট্রেন মাঝে মাঝেই বিভিন্ন স্টেশনে থামছিল।

একটা স্টেশনে বসে বাইরে আরবের সৌন্দর্য দেখছিলাম। এসময় এক আরব বেদুইন এসে বসল আমার সামনে। মাথায় পাগড়ি। গায়ে আরব দেশীয় পোশাক।

আমি আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছিলাম।

সে খাওয়ার জন্য একটি কেক বের করল। আমার ওপর তার হঠাৎ চোখ পড়ল। হালকা হেসে কেকটা দুই ভাগ করে এক টুকরো এগিয়ে দিলো আমার দিকে।

আমি ইতস্ততবোধ করছিলাম।

আমার অবস্থা বুঝে সে মিষ্টি হেসে বলল, ‘তফদাল’ অর্থ— ‘আমাকে অনুগ্রহ করুন।’

আমি কেকের টুকরোটি নিলাম এবং ধন্যবাদ জানালাম।

এই ঘটনা আমাকে অবাক করল। কারণ, ইউরোপে এরকম ব্যবহারের সাথে আমি পরিচিত নই। এই যে অপরিচিত এক সফরসঙ্গীর সাথে কেক ভাগ করে খাওয়ার অভ্যাস আমাকে যেমন অবাক করেছে, তেমনি করেছে মুগ্ধ।

আসলে ইসলাম গ্রহণের পেছনে একটি বড়ো অবদান হচ্ছে, আরব মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর আরবে থাকতে থাকতে একসময় আমি এই বৈশিষ্ট্যের প্রেমে পড়ে যাই। যা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে উৎসাহী করে।

ডোরিয়ান মামার ওখানে থাকার সময়টা ছিল শরৎকাল। প্রায়ই বৃষ্টি হতো। এজন্য আমাকে বেশির ভাগ সময় বাসাতেই থাকতে হতো।

মামার বাসার পেছনেই থাকতেন এক বৃদ্ধ আরব। এলাকার মানুষ তাকে ‘হাজি’ সাহেব বলে ডাকতেন। কারণ, তিনি মক্কা থেকে হজ করে এসেছিলেন। তার অনেকগুলো গাধা ছিল। যা তিনি ভাড়ায় খাটাতেন। এজন্য সব সময়ই তার বাসার উঠানটি ছিল লোকে লোকারণ্য। লোকটি ছিল দরিদ্র। তার গায়ের জামা ছিল মলিন ও ছেঁড়া। কিন্তু সব সময় তার মুখে থাকত তৃপ্তির হাসি।

আরবদের চালচলনে সব সময় জীবনের প্রতি তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পেত। যা আমাকে অবাক করত। তারা প্রতিটা কথাই, কাজে, যেকোনো অবস্থায় স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাত। আমি খুব আগ্রহভরে তাদের সালাত আদায় করা দেখতাম। তাদের প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য আমার কাছে অদ্ভুত লাগত।

সালাতের সময় হলে তারা আশেপাশের সকল মানুষকে জমায়েত করত। তারপর তারা এক লম্বা কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াত। হাজি সাহেব ইমাম হিসেবে তাদের সামনে দাঁড়াতেন। সালাত শুরুর পর সবাই একইসাথে দাঁড়াত, মাথা নিচু করত। আবার একইসাথে মাটিতে কপাল ঠেকাত। সালাতের এই বৈশিষ্ট্যটি আমার কাছে অনেকটা সৈনিকদের একসাথে অনুশীলনের কথা মনে করিয়ে দিত। মনে হতো তারা প্রত্যেকে যেন এক একটা সৈনিক।

প্রার্থনার সাথে এরকম হাত পা চালানোটা আমার কাছে খুবই অযৌক্তিক লাগত।

একদিন হাজি সাহেবকে জিজ্ঞেসও করলাম, ‘আসলেই কি আল্লাহ চান, আপনারা এরকম সকাল-সন্ধ্যা মাটিতে কপাল ঠেকান? এর চেয়ে নিভৃতে প্রার্থনা করাই কি বেশি ভালো না? আর প্রার্থনার সময় এরকম উঠা-বসা করার মানেটাই-বা কী?’

অবশ্য প্রশ্ন করার পরে আমি নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। মনে হলো, একজন ধর্মপ্রাণ মানুষকে আমি আবার অপমান করলাম না তো !

কিন্তু হাজি সাহেবকে মোটেও অপমানিত মনে হলো না; বরং এর জবাব দিতে পেরে তাকে আনন্দিতই মনে হলো। তিনি বললেন, ‘দেখুন, আল্লাহ কি আমাদের দেহ ও আত্মাকে একসাথে সৃষ্টি করেননি? তাহলে এই দুয়ের সমন্বয়ে ইবাদত করলে সমস্যা কী? আপনি কি আমাদের সালাতের পদ্ধতিটি জানেন? আমরা প্রথমে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াই এটা ভেবে যে, মুসলমানদের যে যেখানেই থাকুক না কেন, সে ইবাদতের সময় তার মুখ, মন, ধ্যানধারণা আল্লাহর দিকে কেন্দ্রীভূত করবেন। এরপর আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াই এবং আল্লাহর কালাম থেকে পাঠ করি। আমরা বিশ্বাস করি, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং মানুষকে দেওয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে মানুষ সহজ-সরল পথে অটল থাকে। এরপর আমরা বলি; আল্লাহ্ আকবার, যার অর্থ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

এটা বলার পর আমরা হাঁটুতে হাত রেখে গভীরভাবে নুয়ে পড়ি। কারণ, তাঁকে সবার ওপরে আমরা সম্মান করি।

এরপর সিজদায় লুটিয়ে পড়ি এবং ভাবি, আমরা তাঁর কাছে ধূলিকণা মাত্র। তিনিই আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

এরপর আবার উঠে বসি এবং বলি, তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন, আমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। সরল পথে রাখেন, স্বাস্থ্য ও রিজিক বাড়িয়ে দেন। এরপর আবার সিজদায় যাই।

এরপর উঠে নবি মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য দুআ করি, যিনি আমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আরও দুআ করি পূর্ববর্তী নবি-রাসূলদের জন্য।

এরপর আমরা মাথা ডান ও বাম দিকে ঘোরাই এবং পৃথিবীর যেখানে যত সৎকর্মশীল আছে, তাদের সবাইকে অভিবাদন জানাই ও শান্তি কামনা করি।

এভাবেই আমাদের রাসূল সালাত আদায় করেছেন এবং এভাবেই তিনি সবাইকে সালাত আদায় করা শিখিয়েছেন। যেন প্রতিটি মুসলমান এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন।

আর এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা, যেন প্রতিটি মুসলমান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন এবং সম্পর্ক করতে পারেন তাদের নিয়তির সাথে।’

আমি মুগ্ধ হয়ে হাজি সাহেবের কথা শুনছিলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম আরও অনেক পরে। কিন্তু আমি এখন অনুভব করতে পারি, হাজি সাহেবের সেদিনের কথাগুলোই আমার সামনে ইসলামের দ্বার প্রথম খুলে দিয়েছিল।

আরেকটি ঘটনা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। একবার ট্রেনে ভ্রমণের সময় আমার কামরায় সহযাত্রী হিসেবে ছিলেন এক গ্রিক ব্যবসায়ী এবং এক মিসরিয় গ্রাম্য সরদার। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ীর সাথে আলোচনা হচ্ছিল। আর মিসরিয় গ্রাম্য ব্যবসায়ীটি ছিল পুরোই গণ্ডমূর্খ। এমনকী জানতে পারি যে, সে লেখা তো দূরে থাক, পড়তেও জানে না। সে সময় আরব মুসলমানদের প্রতি আমার মাত্র মুগ্ধতা শুরু হয়েছিল। ইসলামের কিছু বিষয় একটু একটু জানতে শুরু করেছিলাম। সেগুলো আমার কাছে যৌক্তিক ও ইনসাফপূর্ণ মনে হয়েছিল। কথায় কথায় গ্রিক ব্যবসায়ীকে সে কথা জানাই।

গ্রিক ব্যবসায়ী কোনোভাবেই আমার সাথে একমত হতে পারছিল না। সে একটু তাচ্ছিল্যের সুরে পড়ালেখা না জানা মিসরীয় সর্দারকে বলল, কীভাবে তোমাদের ধর্ম ইনসাফপূর্ণ হয়? তোমাদের ধর্মের বিধান অনুসারে একজন মুসলমান পুরুষ ইহুদি-খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু একজন মুসলমান নারীকে ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান পুরুষের কাছে বিয়ে দেওয়া হয় না। এটা কীভাবে সঠিক ও যৌক্তিক হতে পারে?

প্রশ্নটা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হলো। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে মিসরীয় ব্যক্তিটি উত্তর দিলো—

‘অবশ্যই এটা ইনসাফপূর্ণ নিয়ম। আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। আমরা যদিও ঈসা ﷺ-কে আল্লাহর পুত্র বলে মানি না, কিন্তু আমরা মনে করি তিনি আল্লাহর নবি। ঠিক সেভাবে আমরা এটা মানি যে, মুসা ﷺ, ইবরাহিম ﷺ এবং বাইবেলে বর্ণিত সকল নবিকেও পাঠানো হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

সুতরাং কোনো ইহুদি ও খ্রিষ্টান নারীকে যদি কোনো মুসলিমের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে নিশ্চিত থাকতে পারবে, সে যে সকল নবিকে সম্মান করে তাদের সম্পর্কে নতুন পরিবারে কোনো খারাপ উক্তি করা হবে না। কিন্তু কোনো মুসলমান নারীর যদি কোনো অমুসলমানের সাথে বিয়ে হয়, তবে আশঙ্কা থাকে, নতুন পরিবারে সে যাকে আল্লাহর রাসূল বলে মানে তাকে অবমাননা করা হতে পারে।

এমনকী আশঙ্কা থাকে তার নিজের সন্তানও আল্লাহর রাসূলকে অবমাননা করতে পারে। কারণ, সন্তানরা তো তাদের বাবার ধর্ম দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়। তোমার কি মনে হয়, এভাবে একটি মুসলমান মেয়েকে যন্ত্রণা এবং অবমাননার দিকে ঠেলে দেওয়া যৌক্তিক ও ইনসাফপূর্ণ হতো?’

গ্রিক ব্যবসায়ীটি অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারল না।

আমি এই অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তিটির মুখে এরকম বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক যেমনটা অবাক হয়েছিলাম বৃদ্ধ হাজি সাহেবের উত্তর শুনে। অবাক হয়ে ভাবলাম, কোন সেই জ্ঞান যা বিদ্যালয়-কলেজে না যাওয়া মুসলমানদের এমন কথা শেখাল। বুঝতে পারছিলাম, ধীরে ধীরে ইসলামের দরজা আমার কাছে খুলে যাচ্ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আমি ভেতরে ভেতরে আগ্রহী হয়ে উঠছিলাম।

জেরুজালেম আমার এত ভালো লেগে যায়, সেখান থেকে আর ইউরোপের জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এ ছাড়া দিন দিন প্রাচ্য এবং এর মানুষদের প্রতি আমার আগ্রহ আরও বাড়ছিল। তাই আমি একটা বুদ্ধি বের করি। আমি আমার পূর্বের পত্রিকার চাকরিটা ছেড়ে দিই। প্রাচ্য ও আরবদের সম্পর্কে আর্টিকেল লিখে দেবো, এই প্রস্তাব দিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করি। আশ্চর্যজনকভাবে একটি বিখ্যাত পত্রিকা এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায়। তারা আমার লেখার বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেবে বলে রাজি হয় এবং এ বিষয়ে একটি বই প্রকাশেরও আগ্রহ দেখায়। পারিশ্রমিক যদিও অনেক কম ছিল; কিন্তু আমি প্রাচ্যে থাকতে পারছি, এটাই আমার জন্য ছিল বড়ো আনন্দের।

এর ফলে খুব কাছ থেকে আরবদের সাথে মেশার সুযোগ পাই। দেখতে পাই, মুসলিম সমাজের মধ্যে মন ও ইন্দ্রিয়ের এক সহজাত সম্পর্ক রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে জীবনের সকল ভালো-মন্দ আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। নিয়তির প্রতি এই বিশ্বাস তাদের হৃদয়কে সব সময় সজীব রাখে। জীবনে অভাব-অপ্রাপ্তি থাকা সত্ত্বেও তারা সব সময় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। ইউরোপ যা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে।

এ ছাড়া আরবদের অতিথিপরায়ণতা ছিল অসাধারণ। চরম দারিদ্রের মধ্যেও তারা তাদের খাবার অতিথিকে ভাগ করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করত না।

রাজনৈতিক দীনতা, অভাব, অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও আরবরা কীভাবে এ ধরনের মানসিকতা ধারণ করে, তা আমাকে বিস্মিত করছিল। কী তাদের এই প্রশান্তির মূলে— এটা জানার জন্য আমি ইসলাম ও আরব ইতিহাস সম্পর্কে পড়া শুরু করি।

পত্রিকার কাজে আমাকে অনেক দিন কায়রোতে থাকতে হয়। সেখানে আমার অনেক মুসলিম বন্ধু আছে। ইসলামের বিষয়ে আগ্রহ দেখে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আরও সাহায্য করে। আমি আরবি শিখতে এক আরব ছাত্রের কাছে পড়া শুরু করলাম। আগে থেকেই আমার প্রচুর পড়ার অভ্যাস ছিল।

যদিও আমি আরবদের জীবনযাপনে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম-এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে যত বেশি পড়ছিলাম, তত আমি মুগ্ধ হচ্ছিলাম। ইউরোপের মানুষদের ধারণা আরব সমাজের যত অনগ্রসরতা বা কুসংস্কার রয়েছে, তার প্রধান কারণ, তারা ইসলামের মতো

একটা গোঁড়া ধর্মের অনুসরণ করে। কিন্তু আমি উপলব্ধি করলাম, আরবদের ভালো দিকগুলোর ওপরে বহুদিন ধরে চলে আসা ইসলামের এক ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। ইসলামের নিয়মকানুন মানা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যে কুসংস্কার বা গোঁড়ামি তাদের মধ্যে রয়েছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে, তারা পরবর্তী সময়ে কুরআন সম্পর্কে তাদের গবেষণা অনেক কমিয়ে দিয়েছিল। এর ভেতরের মূল্যবোধ অনুধাবন করা থেকে তারা দিন দিন অনেক দূরে সরে যাচ্ছিল।

গভীরভাবে পড়াশোনা করে আমি যা জানতে পারলাম তা হচ্ছে, ইসলামে গোঁড়ামির কোনো সুযোগ নেই; বরং সবসময় জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রথম দিকে অর্থাৎ- প্রথম ৫০০ বছরে মুসলমানেরা জ্ঞান অর্জন এবং গবেষণাকে এক প্রকার ইবাদত হিসেবে দেখত। রাসূল ﷺ ঘোষণা করেছেন, ‘জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য পবিত্রতম কর্তব্য।’ এ কারণে প্রথম দিকের মুসলমানরা বিশ্বাস করত, জ্ঞান অর্জন ছাড়া ইবাদত কখনোই পরিপূর্ণ হবে না।

‘আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেন না, যার কোনো ওষুধ নেই’ রাসূল ﷺ-এর এই উক্তি দ্বারা মুসলমানরা চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তারা অজ্ঞাত ওষুধের অনুসন্ধানকে ইবাদত হিসেবে দেখা শুরু করে।

‘আমি প্রত্যেক প্রাণীকে সৃষ্টি করেছি পানি থেকে’ কুরআনের এই বাণী থেকে তারা মানব সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। এভাবেই তারা গোড়াপত্তন করে জীব-বিজ্ঞানের।

নক্ষত্রমালা এবং এর গতিবিধি সম্পর্কে কুরআনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে মুসলমানরা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অথচ সে সময় অন্য ধর্মের মানুষদের কাছে তা ছিল একটি পূজার বিষয় মাত্র। ইউরোপে মাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস আবিষ্কার করেন, পৃথিবী নিজ কক্ষ পথে আবর্তন করছে এবং সূর্যের চারিদিকে গ্রহাণুপুঞ্জ ঘুরছে। আর এর জন্য তাকে চার্চের আক্রোশের শিকার হতে হয়। অথচ তার ছয়শো বছর পূর্বেই অর্থাৎ নবম-দশম শতকে মুসলমানরা আবিষ্কার করেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার এবং এর একটি নিজস্ব কক্ষপথ রয়েছে। তারা অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা আবিষ্কার করেন এবং অনেকে দাবি করেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। কিন্তু এজন্য তাদেরকে কোনো ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়নি। এভাবেই তারা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শরীরতত্ত্বসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

এ বিষয়ে মূলত তারা নবি ﷺ-এর দেখানো পথই অনুসরণ করেছে। ‘কেউ যদি জ্ঞানের অনুসন্धानে বেরিয়ে পড়েন, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। ‘নেক মানুষের ওপর জ্ঞানীর মর্যাদা এ পরিমাণ, যেমন সকল নক্ষত্রের ওপর রয়েছে চাঁদের মর্যাদা’- এই কথাগুলো সে সময় মুসলমানদের গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা অনেক বাড়িয়ে দেয়।

ইসলামের প্রথম পাঁচশ বছর মুসলমানরা ইসলামের এই সৌন্দর্য অনুভব করেছিলেন। এজন্য তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন। পূর্বে যখন কোনো মহামারি রোগ হতো, তখন ইউরোপের মানুষ তাকে ঈশ্বরের গজব মনে করে হাত গুটিয়ে বসে থাকত। সেখানে মুসলমানরা নবির নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা নিতেন। নবির নির্দেশ অনুসারে মহামারিতে আক্রান্ত এলাকা ও শহরগুলোকে আলাদা করে ফেলা হতো। অথচ বর্তমানে মুসলমানরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে যেকোনো বিপদকে আল্লাহর গজব বলে হাত গুটিয়ে রাখেন।

এমনকী যখন খ্রিষ্টান এলাকাগুলোতে গোসলকে বিলাসিতা বলে মনে করা হতো, তখন সাধারণ গরিব মুসলমানের ঘরেও একটা করে গোসলখানা থাকত। প্রতিটি মুসলমান নগরীতেই ছিল গোসলের ব্যবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, নবম শতকে কর্ডোভাতেই ছিল এরকম তিনশো গোসলখানা। এর পেছনে ছিল ইসলামের একটি নির্দেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। মুসলমানদের ইবাদতের একটি প্রয়োজনীয় অনুষ্ণ হচ্ছে অজু আর গোসল।

যতই পড়ছিলাম, ইসলামের সৌন্দর্য আমাকে ততই মুগ্ধ করছিল। পড়া শুরু করে আমি বুঝতে পারি, আমার ভেতরের মনটি যা খুঁজছিল তা এই ইসলামেই আছে। মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার কাক্ষিত পথটি খুঁজে পেয়েছি। ইহুদি ধর্ম, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা এবং মার্ক্সবাদে আমি যে শান্তি খুঁজে পাইনি, তা আমি খুঁজে পেলাম ইসলামে। কুরআনের পাতায় পাতায় আমি জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। ইসলামে আত্মা ও বাস্তব জীবনের সমন্বয় আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

কিন্তু এত মুগ্ধতা সত্ত্বেও প্রথম দিকে ইসলামের নিয়মকানুন, আনুষ্ঠানিকতা পালনের তেমন আগ্রহ পেতাম না। একদিন আমি আমার এক মুসলমান বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইসলামের এত নিয়মকানুন মানার প্রয়োজন কেন? ভালো কাজের উৎসাহ তো অন্তর থেকে আসা উচিত, তাই না?’

বন্ধুটি বলল, ‘দেখুন, কিছু মানুষ ছাড়া বেশির ভাগ মানুষই ব্যক্তিস্বার্থ ও কামনা-বাসনার জালে বন্দি। সুতরাং সবাই যদি নিজের অন্তরের ইচ্ছা অনুসারে চলে, তবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। আচার-আচরণের কোন পন্থাটি ভালো, কোনটি খারাপ সে বিষয়েও কেউ একমত হতে পারবে না। এখন আপনি বলতে পারেন, কিছু মানুষ তো ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া এমনিতেই ভালো। এজন্য আপনি যদি ওই গুটিকয়েক মানুষের জন্য সবাইকে নিজের ইচ্ছামতো চলতে দেন, তবে এর ফলাফল কি ভালো হবে?’

বন্ধুর কথা শুনে আমি মুগ্ধ হলাম। এরপর আমি ধীরে ধীরে ইসলামের অনুশাসনগুলোর যৌক্তিকতা বুঝতে পারলাম। এভাবেই খণ্ড খণ্ড ঘটনা, কথাবার্তা, বই পড়া, কিংবা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমি ইসলামকে ভালোবাসলাম এবং ইসলামে প্রবেশ করলাম।

১৯২৬ সালে আমি ইউরোপে ফিরে আসি এবং আমার স্ত্রীসহ ইসলাম গ্রহণ করি। আমার মুসলিম নাম রাখি মুহাম্মাদ আসাদ। এরপর মুসলিম সমাজে বসবাস শুরু করি।

আমার অনেক ইউরোপীয় আত্মীয় এবং বন্ধুরা দেখে অবাক হয় যে, কী করে আমি খুব সহজেই মুসলমানদের সাথে মিশে গিয়েছি। কারণ, তাদের বেশির ভাগ মানুষের ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। মুসলমান বলতেই তারা মনে করে এক অনুন্নত, অশিক্ষিত জাতি। আসলে এই জীবনটা কখনোই আমার কাছে কষ্টকর মনে হয়নি; বরং মনে হয়েছে, যে শান্তির খোঁজ আমি এত দিন করেছিলাম, তা আমি ইসলামেই খুঁজে পেয়েছি।

এরপর আমার স্ত্রীকে নিয়ে হজ করতে যাই মক্কার পথে।

এটাই আমি মুহাম্মাদ আসাদের ‘ইসলাম’ নামক শান্তির পথ খুঁজে পাওয়ার ইতিহাস।

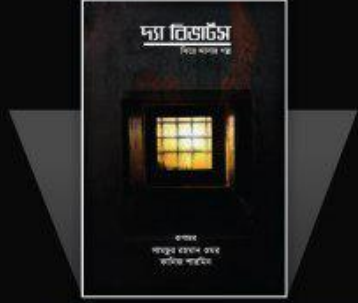
পরিচিতি

মুহাম্মাদ আসাদ ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, লেখক, গবেষক, ভাষাবিদ, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, ইসলামিক পণ্ডিত। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটির জন্ম ১৯০০ সালে এক ইহুদি পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই তাকে ইহুদি ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থের ওপরে দীক্ষা দেওয়া হয়। বড়ো হয়ে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। পেশাগত জীবনে তিনি আরব বিশ্ব ভ্রমণ করেন। আরবদের জীবন ও তাদের জীবনে ধর্মের প্রভাব দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তৎকালীন সৌদি যুবরাজ ফয়সাল ও বাদশা আব্দুল আজীজের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একটা সময় তিনি সৌদি রাজপরিবারের পক্ষ হয়ে দূতীয়ালির কাজও করেন।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় আসাদের মাতাপিতা ইহুদি হওয়ার অপরাধে জার্মান বাহিনীর হাতে নিহত হয়। আসাদ নিজেও লন্ডনে গ্রেফতার হন। তিন বছর কারাভোগের পর তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তান চলে আসেন এবং পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মুহাম্মাদ আসাদকে ধরা হয় ২০ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে।

পাদটীকা

১. হিব্রু ভাষা : হিব্রু ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। বর্তমানে প্রায় ৯০ লাখ মানুষ হিব্রু ভাষায় কথা বলে। যার মধ্যে প্রায় ৫০ লাখ মানুষের বাস ইজরাইলে।
বনি ইসরাইলের মানুষদের মধ্যে হিব্রু ভাষার প্রচলন ছিল। মুসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ “তোরাহ” ছিল হিব্রু ভাষায় রচিত। বর্তমানে হিব্রু ভাষা আধুনিক ইজরাইল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা।
২. তালমুদ, মিশনা ও জেমায়া : তালমুদ হলো হিব্রু ভাষায় লিখিত ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। মিশনা হলো এতে সন্নিবেশিত বিভিন্ন আইন-কানূনের বর্ণনা। আর জেমায়া হলো মিশনাতে লিখিত বিভিন্ন আইনকানূনের ব্যাখ্যা।
ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ঐশী বাণীর পাশাপাশি বিভিন্ন রাক্বি তথা ধর্মীয় পণ্ডিতদের বক্তব্য ও মন্তব্যও স্থান পেয়েছে।



এই ধর্মবিবর্জিত আধুনিক সময়ে আঠারো-উনিশ বছরের তরুণ-তরুণী আসলে কী চায়? তাদের সুখি করে? ঘুরে ফিরে আসবে দামি ল্যাপটপ, মোবাইল, নাটক-সিনেমা, গান, মা কিংবা একজন ভালোবাসার মানুষের কথা। কিন্তু বাস্তবেই কি এগুলো মানুষকে সুখি করতে পা তাই যদি হতো, তাহলে কেন আজ ঘরে ঘরে এত অশান্তি? কেন বাড়ছে আত্মহত্যা, হতাশা মাদকের ব্যবহার? কেন বাড়ছে খুন, হত্যা, ধর্ষণ? সত্যিকারার্থে মানুষের সুখ কোথায়? কো পাওয়া যায় মনের গভীরের প্রশান্তি? আসলে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী?

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমাদের প্রয়াস 'দ্যা রিভার্স : ফিরে আসার গল্প'। আমরা জানব, পশ্চি দুনিয়ায় আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বেড়ে ওঠেও কী করে মানুষ শান্তির আশায় হন্য ঘুরছে। আমরা জানব, কী করে তারা খুঁজে পেলেন জীবনের আসল উদ্দেশ্য, আলোর পথ। জে নিব, অতীত মুছে ফেলে নতুন জীবন গড়তে কোন জিনিস তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।


গার্ডিয়ান
পা ব লি কেশ ন



ISBN: 978-984-92959-8-3